তোতা কাহিনী ও অন্যান্য

জাহিদ হোসেন

তোতা কাহিনী ও অন্যান্য

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৮
প্রকাশক: নিরাপদ
সত্ত্ব: নিরাপদ
ডিজাইন: তাহমিদ রিটু

তোতা কাহিনী ও অন্যান্য

জাহিদ হোসেন

প্রসঙ্গকথা

"তোতা কাহিনী ও অন্যান্য" গ্রন্থের লেখক জাহিদ হোসেন নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স অ্যান্ড প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাক্টিভিটিস অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) এর সাথে তাঁর কর্মজীবনের দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি ২০০৮ থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিরাপদের উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১৯ সালের ০১ জানুয়ারি তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর লেখা স্যাটায়ারধর্মী ফেসবুক পোস্টসমূহের সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে নিরাপদ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। এই সংকলনটিতে মোট ৬৯টি ফেসবুক নোট আছে। এখানে লেখক তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিদ্রুপাত্মক লেখনীর মাধ্যমে চারপাশের সমাজের দৈনন্দিন চিত্র ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর সুনিপুণ রম্যধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন। আশা করি, এটি তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের কাছে মূল্যবান স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হবে।

সূচিপত্র

তোতা কাহিনী

তোতা কাহিনী ১ -	এক জনের ছবি ও তার এক বন্ধুর মন্তব্য ফেসবুকে বির্তকের সূত্রপাত করল	০৯
তোতা কাহিনী ২ -	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবু রায়হানের বাসায় ভাত তরকারি রান্নায় বিঘ্ন হয়েছিলো	১১
তোতা কাহিনী ৩ -	আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ সবাইকে একশ হাত দূরে রাখলো ও ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করলো	১৩
তোতা কাহিনী ৪ -	সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নারীর কারণে কোতোয়ালের কাজে বিঘ্ন ঘটলো	১৫
তোতা কাহীনি ৫ -	দেশের চোরবাটপাড় ও একজন উজির এক শিক্ষকের উপর গোস্বা হলেন	১৮
তোতা কাহিনী ৬ -	পিতার অক্ষমতার কারণে একজন শিক্ষক মনস্তাপ করলেন	২০
তোতা কাহিনী ৭ -	এক মন্ত্রীর নির্দেশের কারণে দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটলো না	২২
তোতা কাহিনী ৮ -	এক ব্যক্তি ডাক্তারকে কসাই বললো ও বিতর্কের সূত্রপাত করলো	২৪
তোতা কাহিনী ৯ -	গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেতন বাড়ানো দাবীতে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল	২৬
তোতা কাহিনী ১০ -	একটা বহুতল ভবন ধসে পড়লো আর পুলিশ এসে ভবনের মালিককে গ্রেফতার করলো	২৮
তোতা কাহিনী ১১ -	একটা পোশাক তৈরি কারখানা ধসে পড়ল আর দেশে মহা হৈ চৈ শুরু হলো	৩০
তোতা কাহিনী ১২ -	ভবনধস দুর্যোগে উদ্ধার কাজ সমাপ্ত হলে পন্ডিতজনেরা স্তম্ভ রচনা ও গোলটেবিল আলোচনায় রত হলেন	৩৩
তোতা কাহিনী ১৩ -	এক ব্যক্তির বাড়ির পাহারাদাররা ফুলের একটা বাগান করল আর দেশের লোক তাদের খুব সুখ্যাতি করল	৩৬
তোতা কাহিনী ১৪ -	জনৈক মোল্লা নারীকে গেরস্থালী কাজে নিযুক্ত থাকার পরামর্শ দিল, এতে নারীরা রাগ করলেন আর পন্ডিতেরা উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভ লিখতে লাগলেন	৩৮

তোতা কাহিনী ১৫ - উচ্চপদস্থ এক সরকারি কর্মকর্তা গরু উপঢৌকন পেলেন আর দেশ থেকে উৎকোচপ্রথা রহিত হল ৪০
তোতা কাহিনী ১৬ - সরকারি দলের সাংসদগণ স্বল্পকালে প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করলেন আর অনেকের নিন্দাভাজন হলেন ৪২
তোতা কাহিনী ১৭ - এক গৃহস্থের বাড়িতে একই রাতে দুই দল তস্কর হানা দিল আর তারা নিজেদের মধ্যে কলহ করল ৪৪
তোতা কাহিনী ১৮ - নির্বাচনের বছর দুই রাজনৈতিক মোর্চা গণতন্ত্র প্রসারে উচ্চকিত হল এবং লগুড় হাতে একে অপরের সাথে মারামারি শুরু করল ৪৬
তোতা কাহিনী ১৯ - রাজনৈতিক নেতাগণ উচ্চফলনশীল মৎস চাষ করলেন এবং স্বল্প কালের মধ্যেই প্রভূত সম্পদের আধিকারী হলেন ৪৮
তোতা কাহিনী ২০ - সংসদভবন লোহার গরাদে অন্তরাল করার সিদ্ধান্ত হল, নাগরিকবৃন্দ এর প্রতিবাদে চেল্লাচেল্লি শুরু করলেন ৫০
তোতা কাহিনী ২১ - সুন্দরবনের এক নদীতে একটা তৈলবাহী জাহাজ ডুবে গেল, আর অমনই সারাদেশে মহা শোরগোল শুরু হল ৫২
তোতা কাহিনী ২২ - উৎসবদিনে কতিপয় যুবক নারীর বস্ত্রহরণ করলো ও পতিসমাজে বহুমাত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি হল ৫৪
তোতা কাহিনী ২৩ - জাতীয় মহাসড়কে তিনচাকারযান চলাচল নিষিদ্ধ হল, জেলা প্রশাসকগণ নসিমন-করিমন-ভটভটি হঠানো কাজে নিযুক্ত হলেন ৫৬
তোতা কাহিনী ২৪ - চৌর্যকর্মে ধৃত শিশু জবানবন্দি আদায়কালে লাঠ্যাঘাতে মারা গেল, দেশের লোক বিচলিত হল ৫৮
তোতা কাহিনী ২৫ - সরকার উচ্চশিক্ষা সেবামূল্যে মূসক আরোপ করল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণের মনে ক্ষোভ সঞ্চার হল ৬০
তোতা কাহিনী ২৬ - বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষকদের প্রহার করল, অনেকেই এর নিন্দা করল আর গণমাধ্যমে বহুমাত্রিক বিতর্কের সূচনা করল ৬২
তোতা কাহিনী ২৭ - শোক দিবসে কেক-প্যাস্ট্রি খওয়ার ব্যবস্থা হল; অনেকেই এতে আপত্তি করলো ৬৪
তোতা কাহিনী ২৮ - ফুটপথে মোটরগাড়ি রাখলে গাড়িওয়ালাকে গাছে বেঁধে রাখা হবে; নগরপতি ঘোষণা দিলেন আর দেশের লোক ধন্য ধন্য রব তুললো ৬৫

তোতা কাহিনী ২৯ - হুকুম হলো স্কুল পালানো ছাত্রছাত্রীকে রাস্তায় দেখলে কয়েদ করা হবে; জাতি গঠনে রাজার সেপাইগণের দায়িত্ব বাড়লো ৬৭
তোতা কাহিনী ৩০ - বালক বালিকার বিয়ের জন্য আইনে বিশেষ ব্যবস্থা হলো অনেকে খুশি হলেন, অনেকেই আবার বেজার হলেন ৬৯
তোতা কাহিনী ৩১ - দৈনিক পত্রিকায় পাঁচ কলামব্যাপী শিরোনামে জঙ্গি তান্ডবের খবর প্রকাশ পেলো - সাধারণ পাঠক এর মর্ম উদ্ধারে গলদ্ঘর্ম ৭১
তোতা কাহিনী ৩২ - এক মুদি বিক্রি না করার জন্য দোকানে পচা মাছ-মাংস জমিয়ে রাখলো ও ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা দিলো ৭৩
তোতা কাহিনী ৩৩ - পল্লীগ্রামে গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ আইন আইন জারি হলো - দেশের মানুষ উল্লাস বোধ করলো ৭৫
তোতা কাহিনী ৩৪ - রাজার প্রহরী নিরাপত্তা তল্লাশি কড়াকড়ি করলো; হাতের থলি আর গায়ের কাপড় ছাড়াই সবাইকে উৎসবে যোগ দিতে হলো ৭৭

অন্যান্য ৭৯
তোরণ নির্মাণ ৮১
সম্পত্তি বাঁটোয়ারা ৮২
বিদ্যা বিতরণ ও গরুছাগল ৮৩
যানজট নিরসন ও দেশের নিরাপত্তা ৮৪
গাড়ির চাকায় দেশ চলে ৮৬
যোগাযোগ মন্ত্রীর পদত্যাগ ৮৭
মন্ত্রীভাগ্য ৮৮
ভেজাল আদিবাসী ৮৯
ডাকাত দমন ব্যবস্থা ৯০
কাদের ডাকাত ৯১
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ৯৩
ওয়ানস্টপ সার্ভিস ৯৪
রবীন্দ্রনাথ বিরল প্রতিভা ৯৫
ম্যাচিয়ুর পার্টি ৯৬
সরকারি অফিসারের অভিজ্ঞতা ৯৭
বাংলাদেশ পুলিশ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ৯৮

উর্দি ও সন্ত্রাস নিরসন - পাকিস্থানি স্টাইল	১০০
বাল্যবিবাহ নিবর্তক ব্যবস্থা	১০২
সন্ত্রাসী লিমন	১০৩
লাল জামা ও দুষ্টের দমন	১০৪
সুদের ব্যবসা ও দেশের ভাবমুর্তি	১০৫
জজসাহেবদের লেনদেন	১০৬
বৈধ-অবৈধ সাংবিধানিক জটিলতা	১০৭
সরকারি কর্মচারি নিয়োগ বিধি	১০৮
হত্যা ও নিহত সমাচার	১০৯
নিয়োগ বানিজ্য ও জেলাধিপতির রোদন	১১০
দিন বদলের সূচনা	১১১
ইউপি সচিব ও পঞ্চাশ টাকা মাত্র	১১২
বৈধ চাঁদাবাজী ও অন্যান্য	১১৩
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী	১১৪
ঢাকা শহরের ফুটপথ	১১৫
কর্মফল নির্ণয়	১১৭
যুগোপযোগী লাইফস্কিল	১১৮
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বদল প্রসংঙ্গে	১১৯

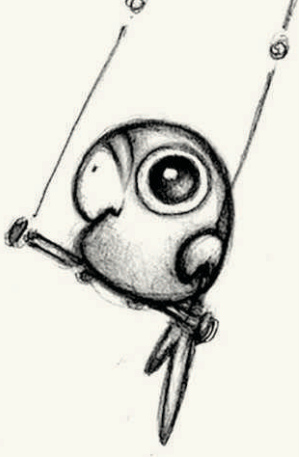

তোতা কাহিনীর পটভূমি

পূর্বকালে পারস্যদেশে আমদ সুলতান নামে এক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তার পুত্র ময়মুন এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে একটা তোতা সংগ্রহ করেন। এই তোতা ছিল মহা জ্ঞানী; সে ভাবীকালের কথা আগেভাগেই বলতে পারত। পারশ্যের কাদির বখশ ফারসিতে তুতিনাম আখ্যানগ্রন্থে এই তোতার বিবিধ কাহিনী বর্ণনা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক চন্ডিচরণ মুন্সী ফারসি আখ্যানগ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এটা তোতা ইতিহাস নামে ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

অতীতকালে পারস্য ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাজ্ঞ ত্রিকালদর্শী তোতা বাস করত। সম্প্রতি, ময়মুনের তোতার মতো আরও এক তোতার আখ্যানগ্রন্থ আবিষ্কার হয়েছে। এই আখ্যানের স্থান ও কাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় করা যায়না। তবে এটা যে পুরাকালের কাহিনী তা প্রায় নিশ্চিত। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, আতর আলি নামের এক যুবকের সাথে এই তোতার বিশেষ সখ্যতা ছিল। আতর আলি ও তোতা গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভাটি অঞ্চলের কোন শহরে বাস করত।

আতর আলি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে পাঠশালায় কিছুদিন পড়ে। অর্থাভাবে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। তবে, সে নানাবিধ বইপুস্তক পড়ত। তাছাড়া, তোতার সাহচর্যে বহুবিধ জ্ঞান লাভ করে। জীবিকা নির্বাহের জন্য আতর আলি নিজেই একটা পাঠশালা খুলে বসে। স্বল্পকালের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে চতুর্দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। বয়সে প্রবীন না হলেও, অনেকেই সলাপরামর্শের জন্য তার কাছে আসত। এমনকি রাজসভাতেও তার ডাক পড়ত।

সদ্য আবিষ্কৃত আখ্যানগ্রন্থে আতর আলি ও তোতার বহু কাহিনী উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে সেসব কাহিনী হুবহু বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বর্তমানকালের পাঠকদের কথা বিবেচনা করে ভাষা একটু আধুনিক করা হয়েছে।

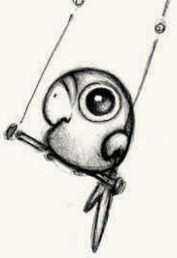

তোতা কাহিনী ১

এক জনের ছবি ও তার এক বন্ধুর মন্তব্য ফেসবুকে বির্তকের সূত্রপাত করল

এক জনের ছবি ও তার এক বন্ধুর মন্তব্য ফেসবুকে বিতর্কের সূত্রপাত করল।

ভাটিরাজ্যে সব কিছুই স্বভাবিক চলছে। ভোরে সূর্য উঠছে, সন্ধ্যায় অস্ত যাচ্ছে। অমাবশ্যা-পূর্ণিমার নিয়ম মেনে চাঁদ উঠছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে, বান-বন্যায় লোকজনের ঘরবাড়ি তলাচ্ছে। শীতকালে ঠান্ডা পড়ছে, দুচারদশজন মারা পড়ছে। গ্রীষ্মকালে গরম পড়ছে; আরও দুচারদশজন মরছে। তৈলতন্ডুলের দাম বাড়ছে। তবে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নাই। দেশের মানুষ সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। চাষারা চাষ করছে। মজুরা কামলা খাটছে। চাকুরেরা অফিস যাচ্ছে। মাস্টাররা কোচিং চালাচ্ছে। ব্যবসায়িরা ভেজাল দিচ্ছে। ডেভোলপাররা নদীনালাখাল ভরাট করছে। সিপাইরা পাবলিক ঠেঙ্গাচ্ছে। রাজকর্মচারিরা ঘুষ খাচ্ছে। নেতারা ভ্রমন করছে আর ফলোয়াররা তোরণ বানাচ্ছে। এক কথায়, সব কিছু একদম ঠিকঠাক চলছে।

তবু, দেখতে নারি তার চলন বেঁকা টাইপের কিছু লোক গেল গেল, সবকিছু রসাতলে গেল রব তুলছে। তাদের হৈচৈ এ দেশের ভাবমূর্তি টানাপোড়েনে পড়েছে। এর একটা বিহিত করার জন্য রাজামশায় সভা ডেকেছেন। এতে আতর আলির ডাক পড়েছে।

সভায় যাবার আগে আতর আলি তোতার সাথে পরামর্শ করতে বসল। আতর আলি বলল সবাই সরকারের সমালোচনা করছে; এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। তোতা বলল বুঝেছি, সেই যে একজন ফেসবুকে ছবি দিয়েছিল আর তার বন্ধু মন্তব্য করেছিল, সেরূপ চিন্তা করা যেতে পারে। আতর আলি বলল সে কী রকম? আর ফেসবুকই বা কী জিনিস?

তোতা বলল, শোন তাহলে; এটা ভাবিকালের কাহিনী, মানুষ তখন অনেক রকম যন্ত্রপাতি তৈরি করবে। যন্ত্রপাতি দিয়েই সব কাজ সারতে চাইবে। ক্যামেরা ছবি তুলবে। কম্পিউটার দিয়ে হিসাবপাতি, সংবাদ আদানপ্রদান ও অফিসকাছারির সব কাজ সারবে। কালি-কলম-কাগজ আর দরকার হবেনা। ফেসবুক বলে এক ব্যবস্থা হবে যার ফলে ঘরে বসেই বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করা যাবে; চিঠি চালাচালি, ছবি দেয়ানেয়া বা তর্কবিতর্ক সব ঘরে বসেই করা যাবে। একবার একজন ফেসবুকে নিজের ছবি দিল। চমৎকার ছবি; তার বন্ধু সেরূপ মন্তব্য করল। এতে মহা বিতর্ক শুরু হল। আতর আলি বলল - বিতর্ক কী নিয়ে? তোতা

বলল - সুশ্রী চেহার জন্য ছবিটা সুন্দর নাকি ক্যামেরাম্যানের কৃতিত্বে সুন্দর হয়েছে। ছবি তোলার কারিগরিতে খারাপ চেহারাও ভালো ফুটে ওঠে; আবার উল্টোটাও হতে পারে। আতর আলি বলল - বুঝেছি; দেশের উন্নতি যা হবার তাতো হয়েছেই; এখন দরকার ভালো ভালো ছবি আর সবাইকে দেখানো। তোতা বলল - ঠিক বলেছ। তবে একাজ সবাই পারে না; বিশেষজ্ঞ লাগে। বিশেষজ্ঞ বিদেশ থেকে আনতে হয়। এরজন্য ইনভেস্ট করা দরকার।

আতর আলি বলল - আর বলতে হবেনা। রাজামশায়কে পরামর্শ দেব, সরকারের সীমিত টাকা দিয়ে ব্রিজ রাস্তা রেলপথ বা পাওয়ার প্লান্ট যা করা যাবে তাতে দেশের লোকের মন ভরবে না। বরং ঐ টাকায় বিশেষজ্ঞ এনে, সুন্দর সুন্দর ছবি দেশিবিদেশি কাগজে ছাপলে বেশি লাভ হবে।

১৮ ডিসেম্বর ২০১১

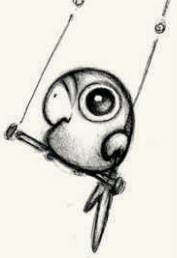

তোতা কাহিনী ২

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবু রায়হানের বাসায় ভাত তরকারি রান্নায় বিঘ্ন হয়েছিলো

আতর আলির বাসায় যে রান্নাবান্না করতো সে অন্যত্র কাজ নিয়েছে। আতর আলি নতুন একটা রাঁধুনি নিয়েছে। এই নতুন রাধুনি অল্প বয়সী মেয়ে, সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। ভাত তরকারি ঠিক মতো রান্না করতে পারে না। ভাত মাঝে মাঝে আধাসিদ্ধ থাকে, আবার কখনও কখনও তা পুড়িয়ে ফেলে। তরকারিতে নুনহলুদ কম বেশি হয়। খাওয়াদাওয়া নিয়ে আতর আলি বেশ কষ্টে আছে। আতর আলি এ নিয়ে তোতার সাথে আলাপ করছিলো।

তোতা বললো - তোমার আবস্থা আবু রায়হানের মত হয়েছে। আতর আলি বললো- আবু রায়হান কে? তার কাহিনী আমাকে শোনাও। তোতা বললো শোন তাহলে এটা একবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের কাহিনী। তখন আবু রায়হান নামে এক ব্যক্তি উপকূলবর্তী এক দেশে বাস করেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে আনেক বছর যাবত কাজ করেন ও শেষে উচ্চপদ লাভ করেন। অবসরকালে তিনি কী করবেন সে বিষয়ে তার অনেক রকম পরিকল্পনা ছিলো। তাছাড়া, তার দুই জামাইও এ বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলো। তবে, আবু রায়হান তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাইলেন না। তিনি সারাদিন বাসায় থাকেন। ঘন্টায় ঘন্টায় চা খান। ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়েন আর রাত জেগে টেলভিশনে টকশো দেখেন। এ সময়ে সারা দুনিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মহা হৈচৈ শুরু হয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনই এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। পত্রিকা পড়ে আল্পদিনের মধ্যেই তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আনেক জ্ঞান অর্জন করে ফেললেন।

আবু রায়হান হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন যে, তার বাসায় খাবার রান্নায় তারতম্য ঘটছে। তরকারিতে হলুদ হয় কম হচ্ছে না হয় বেশি হচ্ছে। ভাতও ঠিকমত রান্না হচ্ছে না, হয় আধাসিদ্ধ থাকছে না হয় বেশিসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির খাবার তিনি আর আগের মতো খেতে পারছেন না। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে ব্যাপারটা তিনি চট করে বুঝে ফেললেন। তিনি ধারনা করলেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হলুদ ও ধানের গুনাগুনে তারতমাই ঘটেছে। এগুলো আর আগের মতো রান্না করা যাচ্ছে না। তিনি এ বিষয়ে আরও গবেষণা করবেন স্থির করলেন।

এরমধ্য একদিন কথায় কথায় আবু রায়হানের স্ত্রী তাকে জনালেন যে, বাসায় যে

রান্নাবান্নার কাজ করতো কয়েকদিন হলো সে চলে গেছে। নতুন একজনকে নেওয়া হয়েছে। এই নতুন রাঁধুনি অল্পবয়সী মেয়ে। তার বাড়ি দূরের এক গ্রামে। নোনাপানিতে তাদের গ্রাম ছয়লাব হয়ে গেছে। তাই তারা শহরে চলে এসেছে। সে রান্নাবান্নার কাজ ভালো জানে না। স্ত্রীর কথায় আবু রায়হানের মাথায় নতুন চিন্তা উদয় হলো। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এমন জ্বাজল্যমান প্রমান তিনি এর আগে কখনও পাননি। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, কী ভাবে মানুষের পুষ্টির অভাব ঘটছে। দুর্যোগের প্রকোপ বাড়ছে আর গ্রামের লোকজন সব শহরে চলে আসছে। উদ্বাস্তু মেয়েরা বাড়ি বাড়ি রাধুনির কাজ নিচ্ছে। কিন্তু রান্নার কাজে তারা তেমন দক্ষ নয়। ফলে রান্না ভাল হচ্ছে না; লোকজন ঠিকমত খেতে পারছে না। এরকম চলতে থাকলে দেশের লোক কঠিন পুষ্টি সমস্যায় পড়বে। আবু রায়হান ভাবলেন এর একটা বিহিত করতে হবে।

বিহিত বের করতে তার খুব একটা বেগ পেতে হলো না। আবু রায়হান ভেবে বের করলেন, এই সমস্যা সমধানের চাবিকাঠি হলো গ্রামের সব মেয়েকে জলবায়ু পরিবর্তনভিত্তিক রান্নার কাজে দক্ষ করে তোলা। তবে, এ কাজে কিঞ্চিত জটিলতা আছে। বাজারে রান্না শেখার যেসব বই আছে সেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরস্থিতি বিবেচনা করে লেখা হয়নি। এগুলো আর কাজে লাগবে না। এখন রন্ধনশাস্ত্র ও জলবায়ু পরিবর্তন একত্র করে রান্না শেখার বই লিখতে হবে। এরজন্য গবেষণা দরকার। আবু রায়হান এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলেন।

সবাই আবু রায়হানের প্রশংসা করল। রাতারাতি চতুর্দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল। অনেক এনজিও ঘোষণা করল যে, এই গবেষণার জন্য তারা ডোনারদের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে। তারপর রান্না শেখনোর জন্য গ্রামেগঞ্জে শত শত ননফর্মাল স্কুল খুলবে। আর যারা স্কুলে যেতে পারবে না তাদের জন্য বড়পর্দার টেলিভিশনের ব্যবস্থা করবে।

কাহিনী শুনে আতর আলি বেশ কিছুক্ষন ভাবলো, তারপর বললো - ব্যাপারটা বোঝা গেলো। তবে আমাদের এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা এখনও শুরু হয়নি; হলে রাজামশায়কে প্রস্তাবটা দিতে পারতাম।

৩০ ডিসেম্বর ২০১১

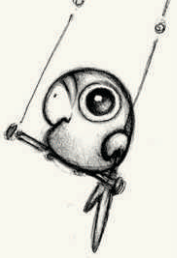

তোতা কাহিনী ৩

আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ সবাইকে একশ হাত দূরে রাখলো ও ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করলো

আতর আলির সংসারে টাকাপয়সার টানাটানি। পাঠশালায় ছাত্র পড়িয়ে যে রোজগার তাতে সংসার চালানো কঠিন। আতর আলি মাঝেমাঝে ভাবে একটা সাইড বিজনেস করবে। তবে কী বিজনেস করবে আর কী ভাবে তা শুরু করে ভেবে কুলকিনারা করতে পারেনা। একবার ভাবে মুদি দোকান দেবে। তেলতন্ডুল সবারই দরকার; মুদি দোকানে কেনাবেচার ঘাটতি হবে না। আর একবার ভাবে, শেয়ার মার্কেটে ঢুকবে; এতে লাভ অনেক। চেনাজানা অনেকেই কোম্পানির কাগজ কেনাবেচা করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অবশেষে সে তোতার সাথে পরামর্শ করতে বসলো।

তোতা বলল, ব্যবসা খুবই সহজ কাজ, তবে সবাই পারে না।

আতর আলি বলল, সে কী রকম; কাজ যদি সহজই হবে তাহলে সবাই তা পারবে না কেন?

তোতা বলল, ব্যবসার জন্য আলাদা টেম্পারমেন্ট লাগে; সবার তা থাকে না। ব্যবসার মূল কথা হলো এক দামে কিনে আর এক দামে বিক্রি করে লাভ করা। কী দামে কিনলে সেটা বড় কথা নয়; বিক্রি করে লাভ করতে পারলে কিনা সেটাই আসল কথা।

আতর আলি - এটা তো সবাই জানে।

তোতা বলল - সবাই জনলেও এর মধ্যে ব্যাপার আছে। ধরো, এখন যেসব ব্যবসা চলছে তুমি তার একটাতে ঢুকে পড়েলেও; যেমন, মুদি দোকান। বাজারে চাল-ডাল-তেল-নুন যা বিক্রি হয় তার একটা ভাগ তুমি পেলে, লাভেরও একটা ভাগ পেলে। তেমন পাইকেড় হলে অন্য সবাইকে হটিয়ে দিয়ে পুরো বাজারটাই দখল করে ফেলতে পারো। তবে এতে খুব একটা কাজের কিছু নয়। কারণ, মোট কেনাবেচার পরিমান বাড়লো না।

আতর আলি - তাহলে কী করতে হবে?

তোতা - ব্যবসার জন্য প্রথমেই দরকার একটা জুতসই আইডিয়া। এমন একটা জিনিস বের করতে হবে যা এর আগে কেউ ভাবেনি। তারপর সেটা মার্কেটিং করবে। দেখবে ধাঁই ধাঁই করে ব্যবসা বাড়ছে আর চারদিক থেকে টাকা আসছে।

আতর আলি - তেমন কিছুতো খুঁজে পাচ্ছি না।

তোতা - এই জন্যই তো তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।

আতর আলি - তুমি কিছু দেখছো?

তোতা - কেন দেখবো না। ভুরি ভুরি সুযোগ দেখছি। আমি তোমাকে ডজন খানেক আইডিয়া দিতে পারি। একটা আইডিয়ার কথা শোনো। দেশে যে পুলিশ আছে তার কাজ হলো আইনশৃংখলা ঠিক রাখার জন্য সবাইকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করা। এই জন্য শুরুতেই এদের শেখানো হয় মানুষ হচ্ছে মহা ত্যাঁদড় তাদের, একেবারে বর্ন ক্রিমিনাল। ডান্ডা মেরে ঠান্ডা না রাখলে এরা আইনশৃংখলার ঘোরতর ক্ষতি করে দেবে। গয়রহ সবাইকে পেটাতে হবে, বাছবিচার করলে চলবে না।

আতর আলি - সবাইকে পেটাতে হবে?

তোতা - হ্যাঁ, সবাইকে পেটাতে হবে। সাংসদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিল কিংবা কিশোরী, তার মা ও বাবা - সবারই সমান অধিকার। সবাই সমান পিটুনি খাবে; তা না হলে আইনের বরখেলাফ হয়।

আতর আলি অনেকক্ষন ধরে ভাবলো, তারপর বলল, তা না হয় হলো, কিন্তু এতে ব্যবসায়ের সুযোগ তো কিছু নজরে আসছে না।

তোতা বলল, এই জন্যইতো তুমি ব্যবসা করতে পারবে না। সেরকম জ্ঞানীগুনী বা নেতামন্ত্রী হলে ইশারাতেই বুঝতে এতে ব্যবসার কী সুযোগ আছে।

আতর আলি - আরও একটু খোলসা করে বলো।

তোতা - শোনো, পুলিশের ডান্ডার হাত থেকে বাঁচতে হলে কী করতে হবে? অন্তত একশ হাত দূরে থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কী ভাবে বুঝবে যে তুমি একশ হাত দূরে আছো? অতি সহজ উপায়; সাথে একটা যন্ত্র রাখো। জুতোপোশাক পরে যখন বাইরে বেরুবে তখন ঘড়ি-কলম-চশমার মতো এই যন্ত্র সাথে রাখবে। একশ হাতের মধ্যে পুলিশ এলে এই যন্ত্র সে থেকে সতর্কসংকেত পাবে। পুলিশের দূরত্ব মাপার একটা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস তৈরি করো, দেখবে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি, উকিল-ব্যারিস্টার, ছাত্র-শিক্ষক, সাংসদ-ভোটার, সাংবাদিক-অসাংবাদিক সবাই কেনার জন্য লাইন দিচ্ছে। তুমি চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারবে। আর এতে দেশেরও লাভ - আইনশৃংখলা একদম তরতাজা থাকবে।

১ জুন ২০১২

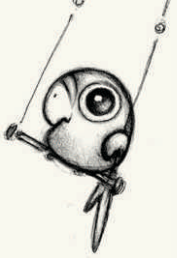

তোতা কাহিনী ৪

সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নারীর কারণে কোতোয়ালের কাজে বিঘ্ন ঘটলো

ভাটিরাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে কিঞ্চিত বিঘ্ন ঘটেছে। কর্তব্যরত এক সহকারী কোতোয়াল তার দুজন সহযোগী নিয়ে শহরের এক রাস্তায় তিন ক্রিমিনালকে লাঠ্যৌষধ প্রয়োগ করে। ক্রিমিনালদের মধ্যে একজন ছিলো কিশোরী আর অন্য দুজন হলো ঐ কিশোরীর মা ও বাবা। প্রকাশ্য রাজপথে লাঠ্যৌষধ প্রয়োগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলোনা দেখে সহকারী কোতোয়াল তিন ক্রিমিনালকে চৌকিতে নিয়ে যায়; সেখানে তিনজনকে আলাদা আলাদা কামরায় কয়েদ করে আর লাঠ্যৌষধ চালাতে থাকে। এই খবর চাউড় হলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নারী সন্ধ্যার পরে কোতোয়ালের চৌকিতে গিয়ে বাহাস শুরু করে ও গভীর রাতে ক্রিমিনালদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এটা সম্ভবত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তবে এরফলে শহরে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক ও কলমবাজরা পক্ষেবিপক্ষে লেখালেখি শুরু করেছেন আর রাজকর্মচারি ও বাক্যবাজরা গোলটেবিল ও টকশোতে বাহাস আরম্ভ করেছেন। আতর আলি যদিও গোলটেবিল বা টকশোতে দাওয়াত পায়নি, তবুও সে এ বিষয়ে তোতার সাথে পরামর্শ করতে বসলো। প্রসঙ্গটা তুলতেই তোতা বলোলো - ঘটনাটা অতি সাধারণ, তবে এরমধ্যে অনেকগুলো জটিল বিষয় জটপাকানো আছে। এগুলো বুঝতে হলে একটা একটা করে জট খুলতে হবে।

আতর আলি বলল- সে কী রকম?

তোতা - প্রথমত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নারীর পক্ষে কি রাতের বেলায় কোতোয়ালের চৌকিতে হাজির হওয়া শোভা পায়? দ্বিতীয়ত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাজ হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়তা করা; সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী যদি বাহাস করে ক্রিমিনাল ছাড়িয়ে আনে তাহলে দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় থকবে কী করে? এ ধরনের কাজ হলো সম্ভ্রান্ত নারীর ভ্রান্তি বিলাস। যে হারে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে তাতে একদিন দেখা যাবে দেশে যতজন ক্রিমিনাল ততজন সম্ভ্রান্ত নারী। তখন সব ক্রিমিনালই এই সহায়তা পাবে, কেউ আর সাজা ভোগ করবেনা। তবে আশার, কথা এমন অবস্থা আসতে অনেক দেরী; বর্তমানকালে বেশিরভাগ ক্রিমিনলই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

আতর আলি - ঠিকই বলেছো।

খানিকক্ষন চুপ করে থেকে তোতা বলল - কয়েকটা ব্যাপারে সহকারি কোতোয়ালকে বাহবা দিতেই হয়। কোতোয়ালের বিরুদ্ধে সবসময়ই অভিযোগ যে সে সময়মত অকুস্থলে পৌঁছাতে পারেনা। তার কাজকারবার শুরু হয় ঘটনা ঘটার অনেক পরে। এখানে দেখো, একেবারে ঠিক সময়েই অকুস্থলে হাজির আর তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। আর এর কর্মদক্ষতা দেখো। সাধারণত, একজন কোতোয়াল একজন ক্রিমিনালের সাথে পেরে ওঠেনা। আসামী ধরতে চারপাঁচজন লাগে; তাও অনেক সময় হাত ফসকে আসামী পগারপার। তিনজন কোতোয়াল তিন ক্রিমিনালকে ধরেছে। একজন শায়েস্তা করেছে মেয়েকে, একজন মেয়ের মাকে আর একজন মেয়ের বাবাকে। তাও আবার শুধু লাঠির মতো সধারণ অস্ত্রের সাহায্যে। লাঠি দিয়ে আজকাল ক্রিমিনাল মোকাবেলা করা যায় না। এইজন্য লাঠির বদলে থ্রিনটথ্রি রাইফেল দেওয়া হয়েছিলো, এতেও কাজ চলল না তখন দেওয়া হলো নাইনশুটার।

আতর আলি - আসলেই এরা দক্ষ কোতোয়াল। তবে আরো উন্নতি করা সম্ভব। প্রশিক্ষণ পেলে এরা এক একজন খালি হাতেই তিনচারজনকে কব্জা করতে পারবে। তাই বলে কী মেয়েদের উপর হাত তুলবে, এটা কেমন কথা?

তোতা - কেন, এতে সমস্যা কোথায়? সক্রেটিসের আমলেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নারী ও পুরুষ সবাই সমান। কোতোয়াল এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য দেখাতে পারে না; সবাইকে লাঠ্যৌষধের ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে।

তোতা আরও বলল - তাছাড়া, এদের মধ্যে একজন ছিলো কিশোরী। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার বিয়ে হবে। তারপর তার সন্তান হবে। দুই সন্তানতো হবেই; চাইলে বেশিও হতে পারে। এরা আবার বড় হবে; তাদেরও বিয়ে হবে, সন্তান হবে। এভাবে জ্যামেতিক হারে দেশে ক্রিমিনালের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এইজন্য, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন টিকা ব্যবস্থা আছে তেমনই জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আগাম প্রতিকার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আতর আলি - কিন্তু এরা যে ক্রিমিনাল তার প্রমান কী?

তোতা - এটা একটা জটিল প্রশ্ন, আবার জটিলও নয়। দেখো, বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়; ছাগলের বাচ্চা ছাগল হয়। কিন্তু মানুষের বাচ্চা মানুষ হয় না। এরা অমানুষ হয়ে জন্মায়; তারপর ক্রমে ক্রমে এরা কোতোয়াল হয়, রাজনীতিবিদ হয়, নেতা হয় বা ব্যবসায়ী হয়। যারা এসব হতে পারেনা তারা হয় জনগণ। কোন কোন দেশে অবশ্য নেতার বাচ্চা নেতা হয়েই জন্মায়, মেয়ে হলে হয় সম্ভ্রান্ত নারী অথবা গার্মেন্টস কর্মী। সাধারন জনগণ খুবই উচ্ছৃঙ্খল; এদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে হলে লাঠ্যৌষধ বিশেষ দরকার।

আতর আলি খানিকক্ষন ভাবলো, তারপর বলল - তাহলে প্রাক্তন আর কর্মরত আমলারা বাক্যবাজদের সাথে গলা মিলিয়ে গোলটেবিল আর টকশোতে কোতোয়ালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলছে কেন?

তোতা - বুঝলে না, এটা হলো হিংসা। এই প্রাক্তনেরা যখন কর্মে বহাল ছিলেন তখন তাদের অধীনে কোতোয়ালরা এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। তাই হিংসায় জ্বলেপুড়ে তারা এসব কথা বলছে। বাক্যবাজদের হিংসা হলো বিষয়টা এনারা আগে চিন্তা করতে পারেননি। আর দৃষ্টান্তমূলক মানে কী? এর মানে হলো লোকদেখানোর দুইএকটা উদাহরণ। এ নিয়ে পাবলিক যাতে বেশি উচ্চবাচ্য না করে সেজন্য কর্মেবহাল আমলারা দুএকজনকে উদাহরণ স্বরূপ একটু আধটু শাস্তি দিতে আগ্রহী।

আতর আলি বলল - ব্যাপারটা অন্য রকমই বটে। এই কোতোয়ালদের আসলে মেডেল পাওয়া উচিৎ। এরা পাড়ায় পাড়ায় সম্বর্ধনা পাওয়ার হকদার। বিশেষ করে যেসব স্কুলকলেজে এদের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে সেখানে এদের নাম ফলাও করা উচিৎ যাতে কোতোয়ালের বাচ্চাদের দেখে অন্য ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে।

৩ জুন ২০১২

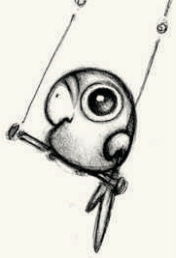

তোতা কাহিনী ৫

দেশের চোরবাটপাড় ও একজন উজির এক শিক্ষকের উপর গোস্বা হলেন

চুরিবাটপাড়ি সন্ত্রাসদুর্নীতি সব দেশেই একটু আধটু থাকে। তবে ভাটিরাজ্যে তা বোধকরি বেশি রকমেই শুরু হয়েছিলো। অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে পড়লো যে সিপাইসালার উজির আমত্যদের কয়েদ করলেন আর নিজে সব কিছু দেখাশোনার ভার নিলেন। কয়েকদিন একটু ভালো চললো। তারপর সিপাইসালার নিজেই তছরুপ শুরু করলেন। দেশের লোক ত্যক্তবিরক্ত উজির সাহেবকে আবার কুরসিতে বসালো।

দেশের লোকের আশা কিন্তু পূরণ হলো না। বাটপাড়ি ও লুটপাট বেড়েই চললো। কলমবাজরা লিখতে লাগলেন; বাক্যবাজরা গেলো গেলো রব তুললেন। কাজের কাজ কিছুই হলোনা। পেয়দারা এসে কলমবাজ আর বাক্যবাজদের ধরে ধরে লাঠিপেটা করলো। এই ডামাডোলের মধ্যে এক শিক্ষক বলে বসলেন, চোরবাটপাড়রের কোন নীতি নাই, উজিরনাজিরদের আছে। এই কথা শুনে দেশের চোরবাটপাড়রা তো মহা খাপ্পা। উজিরসাহেবও ঐ শিক্ষকের উপর ভয়ানক গোস্বা হলেন। তিনি রাজার কাছে নালিশ দিলেন আর দাবী জানালেন, ঐ শিক্ষককে যেন দরবারে ডেকে এনে কুরসির উপর কান ধরে দাঁড় করানো হয়।

ব্যাপারটা আতর আলির কাছে বেশ কনফিউজিং মনে হলো। সে তোতাকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারখানা কী; চোরবাটপাড় আর দেশের উজির, দুতরফই শিক্ষকের উপর এতো গোস্বা কেন?

তোতা বলল, বুঝলেনা, প্রফেশনাল ইমেজে ঘা লেগেছে; গোস্বাতো হবেই।

আতর আলি - সে কী রকম?

তোতা - চোরবাটপাড়ের নীতি নাই, কথাটা একেবারে নির্জলা ভুল। এদের শক্তপোক্ত নীতি আছে। নীতি ছাড়া এরা একেবারেই চলতে পারে না।

আতর আলি - এদের নীতিটা তাহলে কী?

তোতা - কেন? চুরিবাটপাড়ি করা। দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে, গুরুর কাছ থেকে এরা যখন সনদ নেয় তখন এই নীতিতে কবুল দিতে হয়। কেউ যদি বলে এদের নীতি নাই তাহলে এদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। এমন হলে রেজিস্টার থেকে এদের নাম কাটা যেতে পারে।

আতর আলি - বুঝলাম; কিন্তু উজিরসাহেব গোস্বা হলেন কেন?

তোতা - ভাটিরজ্যে উজিরদের নীতি থাকতে নেই। অন্যদেশে থাকলেও থাকতে পারে, ভাটিরাজ্যে এটা চলবে না। লোকজন যদি একবার শোনে ভাটিরাজ্যের উজিরের নীতি আছে তাহলে মহা সর্বনাশ; এরা আর ওজারতি করতে পারবে না।

আতর আলি - কেন পারবে না?

তোতা - তুমি দেখি অতি সাধারণ বিষয়টাও বুঝতে পারছোনা। উজিরের কাজ হলো মানুষকে নয়ছয় বোঝানো; সকালে এক কথা বলা আর বিকেলে আরএক কথা বলা। এনারা যদি নীতির চক্করে পড়েন তাহলে এই কাজ হবে কী করে?

আতর আলি - তাহলে কি এই শিক্ষকের শাস্তি হবে? তাকে কি কান ধরে কুরসির উপর দাঁড়াতে হবে?

তোতা - আসলে হয়েছে কী জানো, অনেক দিন ধরে ছাত্র পড়িয়ে মাথায় একটু টাল হয়েছে। তাই বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। সূক্ষ্ম বিচারে শাস্তি হওয়াই উচিৎ। ছাত্ররা যদি কান ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে পারে তাহলে শিক্ষক কেন কান ধরে কুরসির উপর দাড়াতে পারবে না? তবে এখন আর তা হবার যো নেই; হালে আইন হয়েছে, এমন ধরনের সাজা এখন আর কাউকে দেওয়া যাবে না।

আতর আলি - ভাগ্যিস এমন আইন হয়েছিলো; বেচারা শিক্ষক এবারের মতো পার পেয়ে গেলো।

৫ জুন ২০১২

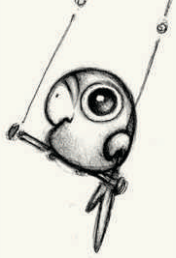

তোতা কাহিনী ৬

পিতার অক্ষমতার কারণে একজন শিক্ষক মনস্তাপ করলেন

কীর্তিমান ব্যক্তির স্মরণ বা সংবর্ধানা অনুষ্ঠানের বেশ প্রচলন আছে ভাটিরাজ্যে। পিতা পিতামহ বা তস্য উর্ধতন পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পনে অর্ধস্থন বংশধররা সভা সমাবেশের ব্যবস্থা করে। এসব অনুষ্ঠানে প্রায়াই আতর আলির ডাক পড়ে। ক্ষেত্র বিশেষ এর জন্য ফরমায়েশি শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্র লিখে দিতে হয় বা সভায় বক্তৃতা দিতে হয়। এতে অবশ্য আতর আলির লাভই হয়; হাতে কিছু পয়াসা আসে। তবে, মাঝে মাঝে আতর আলির মন খারাপ হয়; কারণ অনেক সময় ঐ স্মরণীয় ব্যক্তির কীর্তিকলাপ তেমন সুবিধাজনক থাকেনা। যেমন, এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঠেলাগাড়ি চালাতেন, মালামাল ঠিকানা মতো ডেলিভারি না দিয়ে চকবাজারে নগদ টাকায় বেচে দেন; আর এভাবেই তিনি গ্রুপ অফ কোম্পানির সূচনা করেন। তাছাড়া, রাজকর্মচারির কীর্তিকলাপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় উপরি আয় ও তছরুপ। অধস্তন বংশধরের ফরমাইশে এদের কীর্তিকলাপ কিছুটা সাফসুতরা করে আর খানিকটা কল্পনা মিশিয়ে বর্ণনা করতে হয়।

তোতা আতর আলিকে এনিয়ে মন খারাপ করতে না করলো। তোতা বলল - ভাগ্য ভালো যে এখনো এরা পিতা পিতৃব্যের কীর্তিকলাপ রেখেঢেকে বলতে বলে। এমনও দিন আসতে পারে যখন আসল কীর্তিকলাপ জাহির করে গুণকীর্তন করতে হবে। তখন তোমার অবস্থা হবে ঐ শিক্ষকের মতো যিনি পিতার অক্ষমতার জন্য মনস্তাপ করেছিলেন।

আতর আলি বলল - কে এই শিক্ষক; কী কারণে তিনি মনস্তাপ করলেন?

তোতা - তাহলে শোন তার কাহিনী।

ভূভারতে এক দেশ ছিলো যে দেশে দুর্নীতি সম্পর্কে লোকজনের ধারনা ছিলো ভিন্নরূপ। অন্যরা যাকে দুর্নীতি বলতো, এরা তাকে দুর্নীতি বলতো না। এই দেশে সব রাজ কর্মচারির জন্য উপরি আয় জায়েজ ছিলো; কোনো কোনো বিভাগে এটা ছিলো আবশ্যিক কর্তব্য। উপরি আয়ের মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি করতে পারলে সমাজে মর্যাদা বাড়তো, লোকজন মান্যগণ্য করতো। বিয়েশাদিতে উপরি আয়ের সুযোগসুবিধা বিবেচনা করে পাত্রের দামদর ঠিক হতো। উপরি আয়ের সক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারলে তবেই শ্বশুরবাড়িতে নতুন জামাই'এর কদর। শুধু রাজ কর্মচারিই নয়, অন্যদের জন্যও উপরি আয়ের ভালো বন্দোবস্ত ছিলো। এরা চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি করতো বা মাঠ-ঘাট-নদী-নালা-খাল-বিল দখল করতো। এছাড়াও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ঋণখেলাপি হওয়ার সুযোগ ছিলো।

উপরি আয়ের মাধ্যমে যারা অনেক টাকাপয়সা করতে পারতো সমাজে তারা ভিআইপি মর্যাদা পেতো। বছর বছর তাদের জন্য সংবর্ধনা বা স্মরণোৎসবের আয়োজন হতো। এসব অনুষ্ঠানে গুণিজনেরা এদের কীর্তিকাহিনী প্রচার করে শ্লাঘা অনুভব করতেন আর দেশের তরুণতরুণীদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

ঐ শিক্ষকের পিতা কোতোয়ালের বাহিনীতে চাকরি করতেন। এই চাকরির খুবই রমরমা। কোতোয়ালরা কর্মরত তস্করদের কাছ থেকে বখরা নিতো আর রিটায়ার্ড তস্করদের খোঁজখবর নেবার কাজে লাগাতো। তাই উপরি আয়ের সুযোগও ছিলো অনেক বেশি। তাছাড়া কোতোয়ালরা সাংবাদিক শিক্ষক সবাইকে লাঠিপেটা করতে পারতো। সবাই এই চাকরি পেতে চাইতো। সেইজন্য এই চাকরিতে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি চড়াও দামে কেনাবেচা হতো। তবে, ঐ শিক্ষকের পিতা তেমন করিৎকর্মা ছিলেন না। তার গানবাজনা শখ ছিলো আর গল্পটল্প লিখতেন। যতদূর জানা যায় তিনি উপরি আয় করতে পারতেন না আর লাঠিপেটার কাজেও তার তেমন আগ্রহ ছিলো না। কাজেই বিত্তবৈভব তিনি তেমন সংগ্রহ করতে পারেন নি। দেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন বিরুদ্ধপক্ষ তাকে মেরে ফেলে।

শিক্ষক বেচারা তরুণ বয়সে পিতৃহীন হয়ে বড়ই কষ্টে পড়েন। যাহোক, নিজের চেষ্টায় দেশে বিদেশে পড়াশুনা করলেন; শেষে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। পিতার মতো তারও সাহিত্যচর্চার শখ ছিলো। শিক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখিও চালিয়ে যেতে লগলেন। কিশোর-কিশোরীদের জন্য গল্প লিখে তার বেশ নামডাক হলো। কিন্তু নিজের নামডাক হলে কি হবে, পিতার অক্ষমতার কারণে স্মরণোৎসবে পিতার কোতোয়ালি কীর্তি প্রচারের সুযোগ থেকে তিনি চিরতরে বঞ্চিত হলেন। এই জন্য তার মনস্তাপ হলো।

৮ জুন ২০১২

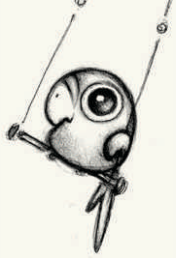

তোতা কাহিনী ৭

এক মন্ত্রীর নির্দেশের কারণে দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটলো না

পাশের দেশে বেশ গোলযোগ শুরু হয়েছে। এক গোষ্ঠি আর এক গোষ্ঠিকে মেরেধরে কচুকাটা করছে। একদলকে রাজার সেপাইরা সাহায্য করছে। অন্য দল পারবে কেন; তারা পালিয়ে ভাটিরাজ্যের দিকে আসছে আশ্রয় নিতে। খবর পেয়ে ভাটিরাজ্যের কোতোয়ালি মন্ত্রী শক্ত আদেশ জারি করলেন, কেউ যেন ভাটিরাজ্যের সীমানায় ঢুকতে না পারে। কঠিন আদেশ। শান্ত্রিসেপাই পড়িমরি করে বর্ডারে বেড়া দিয়ে দিলো। মন্ত্রীমশায় জানালেন, বন্ধুদেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নাকগলানো ভাটিরাজ্যের কাজ নয়।

আতর আলি তোতাকে বলল - এ কেমন কথা, মানুষজন প্রাণের দায়ে শরণার্থী হয়ে আসছে, আর আমরা আশ্রয় দেবো না?

তোতা বলল - কী করে দেবে? এতো জায়গাজমি কি আছে? আর অন্যের ঘরোয়া কোন্দলে জড়াবে কেনো? তাছাড়া ব্যাপারটা সুদূরপ্রসারীও বটে। একজন যদি ঢুকে পড়ে, তাহলে তার পিছুপিছু অন্যরাও হুড়হুড় করে ঢুকে পড়বে। সবাইকে থাকার জায়গা দিতে হবে। খাবার দিতে হবে। দরকার হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এরা যদি বেশিদিন থাকে তাহলে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। তারচেয়ে ওদেরকে বর্ডারে ঠেকিয়ে রাখাই ভালো।

আতর আলি - কিন্তু ওদের যদি কচুকাটা করে?

তোতা - করলে করবে; দেশের সীমানার বাইরে হলে, এতে ভাটিরাজ্যের মান হানী হয়না। তবে মন্ত্রীমশায় মনেহয় সুদুর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এমন নির্দেশ দিয়েছেন।

আতর আলি - সে কী রকম?

তোতা - একবার এক দেশের দুই অংশের মধ্যে যুদ্ধ লাগে। সে দেশের এক গোষ্ঠি আর এক গোষ্ঠির উপর পীড়ন করতো। প্রতিকার চেয়ে হয়রান হয়ে পীড়িতরা শেষে স্বধীনতা যুদ্ধ শুরু করলো। ধুন্ধুমার যুদ্ধ। অনেক গোলাগুলি হলো। বিস্তার ঘরবাড়ি পুড়লো। বেশুমার লোক মরলো। যুদ্ধের শুরু দিকে অনেকেই পাশের দেশে আশ্রয় নিলো। পাশের দেশের সাথে এই দেশের বেজায় শত্রুতা। তারা ভাবলো, শত্রু দেশে বিবাদ, চমৎকার সুযোগ। তারা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করলো না; যুদ্ধেও সাহায্য করলো বিস্তর। স্বাধীনতা যুদ্ধ কামিয়াব হলো। শরণার্থীরা স্বাধীন দেশে ফিরে গেলো। কিন্তু বিপদ বাধলো আর এক জায়গায়।

আতর আলি - কী বিপদ বাধলো?

তোতা - যে দশ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলো সে দেশের নানা গোষ্ঠি যার যার মতো স্বরাজ দাবী করে বসলো। সে এক মহা কেলেঙ্কারি। সরকার এক গোষ্ঠিকে ঠান্ডা করে তো আর এক গোষ্ঠি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দেশের মানুষকে বাঁচাতে সরকারি সেনারা অনেক লোক মারলো; শহরে গ্রামে মারলো, পাহাড়পর্বতে মারলো, বনেজঙ্গলে মারলো, মরুভূমিতে মারলো। শেষে মন্দিরে ঢুকে রক্তপাত করলো। তারপর সবাই একটু ঠান্ডা হলো।

আতর আলি - হ্যাঁ, বিপদটা আঁচ করা যাচ্ছে। পাশের দেশের সাথে বন্ধুত্ব বজায় থাকলে ভাটিরাজ্যে কেউ উচ্চবাচ্য করতে পারবে না; আর কেউ যদি এমন করে, তাহলে দেশের মধ্যেই তাকে শায়েস্তা করা যাবে।

তোতা - তা ঠিক, তবে ব্যাপারটায় আর একটু প্যাঁচ আছে। এই যে শান্ত্রীসেপাইরা বর্ডারে বেড়া দিলো, এতে যদি ফাঁকফোকর থাকে? তাহলে তো পাশের দেশের লোকেরা ভাটিরাজ্যে ঢুকে পড়বে। তখনো তো আর তাদের শরণার্থী বলে চেনা যাবে না। তার থেকে এটাই কি ভালো না যে, এদেরকে শরণার্থী সিল মেরে দেশে ঢোকাও আর দেশবিদেশ থেকে সাহায্য আনো?

আতর আলি - এটা তো আরও ভালো বুদ্ধি। শরণার্থীরাও বাঁচবে, দেশের লোকও দুচারপয়সা কামাই করার সুযোগ পাবে।

১৩ জুন ২০১২

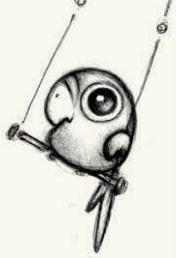

তোতা কাহিনী ৮

এক ব্যক্তি ডাক্তারকে কসাই বলল ও বিতর্কের সূত্রপাত করলো

ভাটিরাজ্যে এক ব্যক্তির এক নিকট আত্মীয়ের কঠিন রোগ হলো। ঐ ব্যক্তি নানাজনের সাথে পরামর্শ করে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। ডাক্তার রোগীর পায়ের নখ থেকে মাথার কেশ পর্যন্ত সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর ও বাহির পরীক্ষা করার জন্য হরেক রকম টেস্ট করালো এবং নানা ধরণের চিকিৎসা করলো। রোগের কোন উপশম হলো না। বরং রোগীর সব টাকা শেষ হয়ে গেলো ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হলো। শেষে ডাক্তার পরামর্শ দিলো অপারেশন করার। ঐ ব্যক্তি রোগীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকাপয়সা জোগাড় করলো আর রোগীকে ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করলো। ডাক্তার রোগ নিরাময়ের কোন নিশ্চয়তা দিলো না কিন্তু রোগীকে জীবিত কিংবা মৃত ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দিলো। অপারেশন আধাআধি হতেই রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ হলো। ডাক্তার তখন বাকি পাওনাপত্তর বুঝে নিয়ে মৃত রোগীকে তার আত্মীয়র কাছে ফেরত দিলো। ঐ ব্যক্তি তখন ডাক্তারকে বলল কসাই।

এই কথায় ভাটিরাজ্যের সব ডাক্তাররা ভয়ানক রুষ্ট হলো। তারাও বলল, ডাক্তারা কখনো কসাই হতে পারেনা; তাদের কাজ জনসেবা করা। বাক্যবাজরা তক্কেতক্কে ছিলো; তারা দুই দলে ভাগ হয়ে তর্ক শুরু করলো। দেশের কসাইরা এতে মাহা বিরক্ত হয়ে বলল, ডাক্তারের সাথে কসাইএর তুলনা ঘোরতর অন্যায়; এতে কাসাইদের মানহানী হয়। কসাইদের প্রতিবাদে তর্কের বেগ আরও বাড়লো। তবে তর্কেও বিষয়বস্তু যে ঠিক কী, আর আলোচনা যে ঠিক কোন দিকে মোড় নিচ্ছে কেউ তা বুঝতে পারছিলো না। আতর আলি তোতাকে বলল, এসো ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই।

তোতা বলল - বিষয়টা বুঝতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে কসাইএর কাজগুলো কী; সেই সাথে দেখতে হবে ডাক্তারের কাজগুলো কী; তারপরে দেখতে হবে এর মধ্যে কোথায় কোথায় মিল আর কোথায় কোথায় অমিল।

আতর আলি - কাসাইএর কাজ মাংস বিক্রি করা। এতে লোকজনের পুষ্টি রক্ষায় সাহায্য হয়। এটা এক ধরণের সেবা বলা যায়।

তোতা - এ্যডাম স্মিথেরও ঐ মত। কসাই ও রুটিওয়ালা জনগনের পুষ্টি রক্ষায় সেবা দেয়। তবে যে পরিমান টাকা, সেই পরিমান সেবা। ডাক্তারও সেবা দেয়; তার সেবা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। এক্ষেত্রেও আজকাল যে পরিমান টাকা সেই পরিমান সেবা।

আতর আলি - দুজনের মধ্যে বেশ মিল আছে দেখছি। টাকার বিনিময়ে একজন পুষ্টি রক্ষা করে, আর এক জন স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তবে মার্কেটিং স্ট্রাটেজিতে কিছুটা অমিল আছে। বাজারে গেলে কসাই ডাকাডাকি করে মাংস কিনতে বলে। ডাক্তারের বেলায় এ্যপয়েন্টমেন্ট করে সেবা নিতে হয়।

তোতা - অমিলটা বাহ্যিক; আসলে তেমন কোন পার্থক্য নাই; মূলনীতি একই। একজন চড়াগলায় হাঁকডাক করে, অন্যজন নজরকাড়া সাইনবোর্ড লাগায়। একজন কান দিয়ে অন্যজন চোখ দিয়ে মর্মে ঢোকার চেষ্টা করে। কান আর চোখ, এই যা পার্থক্য।

আতর আলি - আরও একটা মিল আছে। দুই দলই কাটাছেঁড়া করে। একজন জ্যান্ত পশু, আসুখবিসুখ না থাকলে, কেটেকুটে সাইজ করে; অন্যজন জ্যান্ত মানুষ, আসুখবিসুখ তেমন মাত্রায় থাকলে, কেটেকুটে জীবিত বা মৃত ফেরত দেয়।

তোতা - তবে কোয়ালিটি এ্যস্যুরেন্সে অমিল অনেক। প্রাচ্যদেশে বিক্রিত পণ্য ফেরত হয়না। হাতবদলের সাথে সাথেই বিক্রেতার দায়িত্ব শেষ। কোয়ালিটি নিশ্চিত করার দায়দায়িত্ব কাস্টমারের। যাঁচাইবাছাই করে কিনিতে হয়। পুষ্টি রক্ষা সেবার বেলায় পোস্টপেইড সার্ভিস; মাংস আলু পটল পেঁয়াজ দেখেশুনে যাঁচাই করে নেওয়া যায়। কসাই চোখের সামনে কাটাকুটি করে; কাস্টমার দুচারটে সাজেশন দিতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষা সেবার বেলায় তা হবার যো নেই। প্রিপেইড সার্ভিস; চোখের আড়ালে কাজকারবার; ডাক্তারের কথাই চূড়ান্ত।

আতর আলি - পার্থক্যটা মৌলিকই বটে। ডাক্তারকে কসাই বললে একজনের মান হানী হবারই কথা। তবে কার মান যে হানী হচ্ছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। মনেহয় এ বিষয়ে আরও গবেষণা দরকার আছে।

১৪ জুন ২০১২

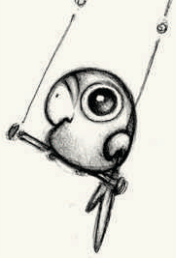

তোতা কাহিনী ৯

গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেতন বাড়ানো দাবীতে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল

গার্মেন্টস শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই ঝমেলা পাকায়। বেতন বাড়ানোর দাবীতে অন্দোলন করে; ভাঙ্গচুর করে। বড়ই বিশৃঙ্খলা হয়। তখন শান্ত্রিসেপাই দিয়ে পিটিয়ে বশে আনতে হয়। ভাটিরাজ্যে এই সমস্যা কিছুতেই দূর হচ্ছেনা। এই নিয়ে তোতার সাথে আতর আলির কথা হচ্ছিলো।

তোতা বলল ঝমেলা দূর হবে কী করে? এদের বেতন কম; জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। সংসার চলে না। এদের মাথাতো গরম হবেই। বেতন না বাড়লে এরকম চলতেই থাকবে।

আতর আলি - বেতন বাড়াবে কী করে? কোম্পানির মালিকরা বলছে, কয়েক হাজার করে শ্রমিক, এদের বেতন বাড়াতে গেলে অনেক টাকা লাগে। এতো টাকা ওদের নাই।

তোতা - কথাটা খুব খাঁটি। গার্মেন্টস কোম্পানির মালিকদের অনেক খরচ। হালিখানেক আলিশান বাড়ি আর হাফডজন বাড়ি মেইনটেন করতে অনেক খরচ। এছাড়া বছরে দুএকবার সপরিবারে বিদেশ ভ্রমন। ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে পড়ছে। বেশ খরচবহুল ব্যাপার। তার উপর আবার ব্যবসার গ্রোথও ঠিক রাখতে হয়। ফি বছর একটা করে ফ্যক্টরি না বাড়ালে চলেনা।

আতর আলি - এই জন্যই বোধহয় তারা ঋণ খেলাপি হয়। শ্রমিকরা কিন্তু এসব কথা বুঝতে চায়না।

তোতা - শ্রমিকরা বেশি লেখাপড়া শেখেনি; তারা এসব বুঝতে পারেনা। এজন্য আবার মালিকদের এক্সট্রা ভোগান্তি কোম্পানির বড় বড় পদে বেশি বেতনে বিদেশি নিয়োগ দিতে হয়। তাছাড়া একাউন্টেন্ট লাগে ডবল ডবল।

আতর আলি - ডবল ডবল একাউন্টেন্ট লাগে কেন?

তোতা - ট্যাক্স, অডিট আর বায়ারদের কমস্প্লাইন্স ঠিক রেখে ব্যবসা করতে গেলে দুসেট করে খাতাপত্র লাগে। দুজন করে একাউন্টেন্ট লাগে।

আতর আলি - সমস্যা সমাধানের উপায় তো দেখছিনা।

তোতা - সমস্যা তেমন ছিলো না। পুরুষ শ্রমিক ঢোকার পরে জটিলতা বেড়েছে।

আতর আলি - পুরুষরা আবার কেমন করে জটিলতা বাড়ালো

তোতা - এটা অর্থনীতির নিয়মের মধ্যে পড়ে। পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় গ্রামীণ নারী শ্রমিকের মার্জিনাল কস্ট অনেক কম। নারী শ্রমিক সস্তায় পাওয়া যায়। তাছাড়া এদেরকে সহজেই শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা যায়। কমবয়সী মেয়ে হলে আরও ভালো।

আতর আলি - ঠিক বলেছো। গ্রাম থেকে আসা মেয়েরা কাজে করে বেশি, মজুরি নেয় কম। পুরুষরা খালি ঝামেলা পাকায়। এদের সোজা পথে আনতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ লাগে।

তোতা - তাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি জনিত সংকটে মেয়েরা পার্টটাইম সেক্সট্রেডে যুক্ত হতে পারে।

আতর আলি - এটা কী খুব ন্যায়সংগত হলো?

তোতা - মোটেই ন্যায়সংগত হলো না। বালা যায় ঘোরতর অন্যায়। তবে দেশের শিল্পোন্নতি যারা চায় তারা অতো ন্যায়-অন্যায় বিচার করেনা। দেশের উন্নতির জন্য কাউকে না কাউকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই ব্যাপারে গ্রামের মেয়েদের উপর নির্ভর করাই সব থেকে সুবিধাজনক। বিংশ শতাব্দিতে দেখা যাবে অনেক দেশই এভাবে রাতারাতি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হচ্ছে।

আতর আলি - বেশ বুঝতে পারছি। এক জেনারেশন মেয়েরা নাহয় কষ্ট করলো। দেশকে তো শিল্পোন্নত করতে হবে। মালিকদের উপর বেশি চাপ দেওয়া যাবে না। দরকার হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ আরও বাড়ানো যেতে পারে।

১৫ জুন ২০১২

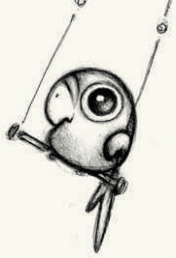

তোতা কাহিনী ১০

একটা বহুতল ভবন ধসে পড়লো আর পুলিশ এসে ভবনের মালিককে গ্রেফতার করলো

মহাসড়কের পাশে ডোবা ভরাট করে, ছয়তলার ভিত গেঁথে, তার উপর নয়তলা ভবন তৈরি করা হয়েছিল। এর নিচের দিকের তলাগুলতে ছিল দোকান ও একটা ব্যাংক আর উপরের কয়েক তলায় ভারি ভারি মেশিন বসিয়ে চালু হয়েছিল পোশাক তৈরির কারখানা। ভবনে কিঞ্চিত ফাটল দেখাদিয়েছিল। কয়েকজন দুষ্টুলোক এসে একটু নাড়া দিতেই পুরো ভবনটা হুড়মুড় করে ধসে পড়লো আর প্রায় হাজার চারেক পোশাককর্মী ভাঙ্গা দালানের নিচে চাপা পড়ে গেল। পাড়াপড়সি, দমকলবাহিনী ও সেনাসদস্যদের দশবারো দিনের খাটাখাটনিতে হাজার আড়াই শ্রমিক জীবিত উদ্ধার পেলেন, ছয়সাত'শ লাশ খুঁজে পাওয়া গেল আর বাকি শ্রমিকেরা নিখোঁজ থাকলেন।

পুলিশমন্ত্রী দুষ্টুলোকদের উত্তমমধ্যম দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। টাকশালমন্ত্রী এই সামান্য কয়েকশ শ্রমিকের মৃত্যুতে আদৌ কাতর হলেন না। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে এতে যে শ্রম ঘাটতি হবে তা নেহাতই যৎকিঞ্চিত; দেশের অর্থনীতির উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু দেশের লোক এমন হৈচৈ শুরু করলো যে পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভবনের মালিক আর পোশাক কারখানার মালিকদের গ্রেফতার করলো। এতে দেশের ভাবমূর্তি ভয়ানক ক্ষুন্নহলো। পোশাক শিল্প মালিকেরা মহা ব্যাজার হলেন। তা সত্ত্বেও তারা দানদক্ষিণা সংগ্রহ করে আহতনিহত শ্রমিকদের জন্য খয়রাতি সাহায্য দানের ঘোষণা দিলেন। এতে সবাই খুশি হলো না নাখোশ হলো, তা বোঝা গেল না। তবে আইন মাফিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করলো না।

আতর আলি বেশ ধান্ধায় পড়ে গেলো। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে, দুষ্টলোকদের ধাক্কাধাক্কিতে ভবন যদি ধসে পড়ে তাহলে মালিকদের আপরাধ কতটুকু? তবে সে এটুকু বুঝতে পারলো যে, ডোবা ভরাট করে দুর্বল কাঠামোর উপর নয়ছয় করে বহুতল দালান তোলাটা ভবনমালিকের অপরাধ; আর কারখানার মালিকদের অপরাধ হোল এই নড়বড়ে ভবন ভাড়া নেওয়া।

তোতা বলল - তাহলে তো মহা ঝামেলা। এই হিসাবে ঐ ভবনের সব দোকানদার আর ব্যংকের মালিককেও হাজতে পোরা উচিৎ। তাছাড়া, রাজধানীতে হাজার হাজার বহুতল ভবন এমন খানাখন্দ ভরাট করে দুর্বল কাঠামোর তৈরি হয়েছে। যারা এইসব ভবন তৈরি করেছে আর যারা এসব

ভবনের ফ্লাট কিনেছে তারাও একই অপরাধে অপরাধী। এদেরকে শাস্তি দিতে গেলে লোম বাছতে কম্বল উজাড়।

আতর আলি - এসব ভবন তো প্রতিদিন ধসে পড়ছে না, আর এতে কেউ মারাও যাচ্ছে না। এনিয়ে উচ্চবাচ্য করার দরকার হয়না।

তোতা - আসলে আচমকা একসাথে অনেক লোক মারা গেছে তাই এতো হৈচৈ। এই মালিকদের বড় অপরাধ হলো ভালকিভুলকি দিয়ে আর জবরদস্তি করে ফাটল ধরা ভবনে শ্রমিকদের ঢুকিয়ে ভারি ভারি মেশিন চালানো। তবে ভবনধ্বসে কেউ মারা না গেলে এতে দোষের কিছু ছিল না।

আতর আলি - শ্রমিকদের জোর করে কাজে লাগানো ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।

তোতা - শ্রমিকেরা যদি স্বেচ্ছায় কাজে যোগ দিতো তাহলে আর এত ঝামেলা হতো না। সবাই একটু শোক প্রকাশ করতো আর মূর্খ শ্রমিকদের প্রাণভরে গালমন্দ দিত। এখন কার কী দোষ তার চুলচেরা বিচার করতে হচ্ছে আর কার কী শাস্তি হওয়া উচিৎ তা নিয়ে সবাই তোলপাড় করছে। আর একটা হুজুগ না আসা পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে।

আতর আলি - এদের থেকে লঞ্চযাত্রী অনেক ভালো। তারা স্বেচ্ছায় ফিটনেস বিহীন লঞ্চে অতিরিক্ত হয়ে বোঝাই হয়। বছরে দুএকটা লঞ্চ ডোবে। দু চার পাঁচ শ যাত্রীর সলিল সমাধি ঘটে। দেশের লোক একটু মনখুলে শোকসন্তাপ করতে পারে। এই নচ্ছার শ্রমিকদের বেলায় সেটি হবার জো নেই।

৭ মে ২০১৩

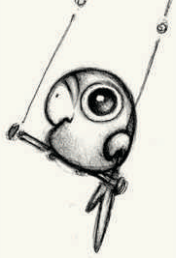

তোতা কাহিনী ১১

একটা পোশাক তৈরি কারখানা ধসে পড়ল আর দেশে মহা হৈ চৈ শুরু হলো

সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল রফতানিমুখি শিল্প প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কী আছে সে বিষয়ে ভাটিরাজ্যে বিস্তর বিতর্ক হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে তোতা নিচের কাহিনীটির অবতারণা করল।

একদেশে জনসংখ্যার আধিক্য ছিল আর এর বেশিরভাগই ছিল গরিব। সেই দেশে শিক্ষার প্রসার ছিল নামেমাত্র। এই অবস্থায় উৎসাহী কয়েক ব্যক্তি পোশাক তৈরির কারখানা চালু করল ও তৈরি পোশাক বিদেশের বাজারে বিক্রি শুরু করল। এতে তারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে পড়ল। দেখাদেখি আরও অনেকেই পোশাক তৈরির কারখানা খুলতে লাগল। বিদেশি মুদ্রার আকর্ষণে দেশের সরকারও এর পৃষ্ঠপোষণ করল। অচিরেই দেশের প্রধান শহরগুলোতে শত শত পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে উঠল। আর লেখাপড়ার সুযোগ বা নগদ আয়ের সুযোগ না থাকার কারণে গ্রামের কিশোর-কিশোরী দলে দলে এসে এসব কারখানায় যোগ দিতে লাগল।

এই পোশাক শিল্পের রমরমা আর বিদেশি মুদ্রায় মায়ায় দেশের সরকারের নীতিনির্ধারকগণ এতই অধীর হলেন যে, প্রচলিত শ্রম আর শিল্প আইন কাটছাঁট করে এই শিল্পের জন্য মালিকবান্ধব বিশেষ ব্যবস্থা করলনে। মালিকদের জন্য কর মৌকুফ ও নগদ প্রণোদনের ব্যবস্থা হলো। শ্রমিকের ন্যূনতম বেতনের বালাই থাকল না; মাতৃত্বকালীণ ছুটি অন্য শিল্পের তুলনায় অর্ধেক হলো। কারখানায় দুর্ঘটনা ঝুঁকি নিরসনের ব্যবস্থা থাকল না, আর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা অবান্তর হয়ে পড়ল। সেই সাথে, শ্রমিকদের মেরেধরে কাজ আদায়ের জন্য শিল্পপুলিশের ব্যবস্থা করা হলো। পোশাক শিল্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তবে, মাঝে মধ্যেই কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটত। কারখানায় আগুন লাগত বা কোন ভবন ধসে পড়ত। এতে দুচারদশ গন্ডা শ্রমিক হতাহত হতো। এ নিয়ে কয়েক দিন উচ্চবাচ্য বাক বিতর্ক চলত; তারপর আগের মতোই কারখানার কাজ শুরু হতো।

একবার একটা বহুতল কারখান হঠাৎ ধসে পড়ল। প্রায় হাজারচারেক শ্রমিক ভাঙ্গা দালানের নিচে চাপা পড়লেন। পাড়াপড়সি, দমকল কর্মী ও সেনা সদস্যরা ছুটে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করলেন। আত্মীয়-বন্ধুরা দৌড়ে এলেন আর স্বজনদের খুঁজে বের করার জন্য ছুটোছুটি করতে লগলেন। কাছে-দূরের অনেক লোক উদ্ধারকাজ আর আহাজারি দেখার জন্য ভিড় জমালেন। সংবাদকর্মীরা এলেন। তারা আহত-অনাহত শ্রমিক, দর্শনার্থী জনতা ও উদ্ধারকর্মীদের তাৎক্ষণিক

মনোভাব যাঁচাই করতে লাগলেন আর বিবিধ শালীন-অশালীন সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করতে লাগলেন। রাজনৈতিক নেতারা যথারীতি বিবিধ সভাসমিতির প্রধান-অপ্রধান আসন অলংকৃত করে ভবন ধসের কার্যকারণ, এর নিরাময় ও দেশের ভাবমূর্তি বিষয়ে ভাষণ দিতে থাকলেন। দেশে মহা হৈ চৈ শুরু হলো। ভবন আর কারখানার মালিকেরা পলাতক হলেন; কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় অচিরেই তারা গুষ্টিসুদ্ধু কয়েদ হলেন। বিদেশের বাজারে এর ঢেউ গড়াল। বিদেশি ক্রেতারা এদেশের এই পণ্য কিনতে নিমরাজি ভাব দেখালেন।

বিশদিন পরে উদ্ধারকাজ শেষ হলে সবাই যার যার মতো বাড়ি ফিরে গেলেন। পন্ডিতেরা তখন স্তম্ভ লেখা ও গোলটেবিল আলোচনা শুরু করলেন। আর পোশাক শিল্পের মালিকেরা নিজেদের অর্থঘাটতিজনিত সমস্যা ও পোশাক শিল্প সুরক্ষায় দেশপ্রেমিকের করনীয় সম্পর্কে মতামত জাহির করতে লাগলেন। এ সব আলোচনা থেকে দেশের লোক সম্যক অবগত হলেন যে বিদেশি ক্রেতারা ভয়ানক পাজি; তারা অতি কম দামে তৈরি পোশাক কেনে। আর পোশাক শিল্পের মালিকেরা অতি দুঃখী; তারা অর্থঘাটতির কারণে কোনভাবেই শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি দিতে পারেন না বা দুর্ঘটনা ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন না। বিজ্ঞজনেরা সকলে একমত হলেন যে, বিদেশি ক্রেতারা যদি একটু বেশি দামে তৈরি পোশাক কেনে অথবা দেশের সরকার ট্যাক্সের টাকায় কারখানাগুলো খাস জমিতে নতুন করে নির্মান করে দেয় তাহলে বিষয়টার একটা সুরাহা হয়।

কাহিনীর এই পর্যায়ে আতর আলি প্রশ্ন করল - পোশাকশিল্প শ্রমিকের মজুরি কী ভাবে ধার্য হয় আর তারা কী হারে মজুরি পেয়ে থেকে?

তোতা - পোশাকভেদে সেলাই বাবদ খরচ কমবেশি হয়, তবে প্রতি প্রস্ত পোশাকের মূল্যে দেশিয় মুদ্রায় ন্যূনতমপক্ষে ৮০ টাকা সেলাইয়ের মুজুরি হিসাবে ধার্য থাকে। ২০জন শ্রমিকের একটা লাইন ঘন্টায় ২০০ প্রস্ত এই ধরণের পোশাক তৈরি করতে পারে। কারখানার মালিকেরা প্রতি শ্রমিককে ঘন্টায় গড়ে ২০ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন দিয়ে থাকে।

আতর আলি - এই হিসাবে তো দেখা যায় শ্রমিকের মজুরিতো অনেক বাড়ানো সম্ভব।

তোতা - তা হয়তো সম্ভব। তবে পোশাকশিল্প মালিকদের দাবী, শ্রমিকের মজুরি বাড়ালে মালিকেরা একেবারে পথে বসবে। তাদের গৃহে তৈলতন্ডুলের সংস্থান করা যাবে না আর ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ চালানো সম্ভব হবে না। সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা এ বিষয়ে ওয়য়াকিবহাল ও একমত। তারা ব্যবস্থাপত্র পোশাকশিল্প মালিকদের মর্জিমাফিকই করে থাকেন। আর বিজ্ঞজনেরাও এ বিষয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করেন না।

আতর আলি - শেষে কী হলো?

তোতা - কী আর হবে? দিন কয়েকের মধ্যে হৈ চৈ সব থেমে গেল। যে সব শ্রমিক তেড়িবেড়ি দেখালো তারা পুলিশের লাঠিচার্জের কবলে পড়ল। কালক্রমে বিদেশি ক্রেতারা অন্যত্র সস্তা শ্রমের বাজার খুঁজে বের করল। অনেক শ্রমিক ঘন্টায় ২০ টাকা মজুরিতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বহাল থাকার বদলে গ্রামে ফিরে গিয়ে হাঁস-মুরগি-ছাগল পালনে মনযোগী হলো। পোশাক শিল্পের জোয়ার ভাটার টানে বিলীন হয়ে গেল।

২১ মে ২০১৩

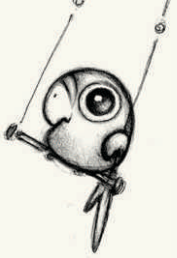

তোতা কাহিনী ১২

ভবনধস দুর্যোগে উদ্ধার কাজ সমাপ্ত হলে পন্ডিতজনেরা স্তম্ভ রচনা ও গোলটেবিল আলোচনায় রত হলেন

বহুতল ভবনে অবস্থিত পোশাক তৈরি কারখানা হঠাৎ ধসে পড়ল আর প্রায় সাড়ে তিনহাজার শ্রমিক ভগ্নস্তুপের নিচে চাপা পড়ল। টানা বিশদিন ধরে কাজ চালিয়ে এদের শতকরা সত্তুর জনকে জীবিত ও বাকিদের মৃত উদ্ধার করা হলো। উদ্ধার কাজ শেষ হলে পন্ডিতজনেরা স্তম্ভ রচনা ও গোলটেবিলে রত হলেন আর এ বিষয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। আতর আলি তোতার সাথে এ বিষয়ে একটা আলোচনা চালিয়ে ছিল।

আতর - যেনতেন প্রকারে জলাভূমি ভরাট করে ছয়তলা ভিতের উপর নয়তলা ভবন তৈরি করলে সম্পদের সাশ্রয় হয় বটে, তবে ভবনগুলো ধসে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। আর এসব ভবনে ভারি ভারি যন্ত্রপাতি বসিয়ে পোশাক তৈরি কারখানা চালু করলে এই ভবনধসের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

তোতা - দেশের উন্নয়নের জন্য সম্পদস্বল্পতা আমলে নিয়ে সম্পদসাশ্রয়ী বিবিধ ব্যবস্থাপত্র চালু করা হয়। শিশুশিক্ষা প্রসারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রামে গ্রামে কম বেতনে কম লেখাপড়া জানা শিক্ষক নিয়োগ দেয়। মহাসড়কে ট্রাক-বাস চালানোর জন্য বকলম ব্যক্তিরা মাণ্যবর মন্ত্রীগণের তরফ থেকে ড্রাভিং লাইসেন্স পায়। একইভাবে ডেভেলপাররা জলাভূমি ভরাট করে আর ছয়তলা ভিতের উপর নয়তলা ভবন নির্মান করে।

আতর - দুর্বল কাঠামোর ভবনে যারা পোশাক তৈরি কারখানা চালু করে তারা নিশ্চয় খুব সাহসী।

তোতা - আসলে তারা অতিশয় দেশপ্রেমিক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো আর দেশকে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এই ঝুঁকি নেয়। মাঝে মধ্যে দুএকটা দুর্ঘটনা ঘটে, তবে এতে তাদের দেশপ্রেমে কোন ঘাটতি দেখা দেয় না। ধসেপড়া কারখানা ভবনটিতে আগেরদিন ফাটল দেখা দিয়েছিল। এতেও কারখানার মালিকেরা পিছপা হননি। অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য তারা ইউএনও আর ভবনের মালিকের সহায়তায় শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন।

আতর - কিন্তু পুলিশ তো ভবন আর কারখনার মালিকদের গেরেপ্তার করেছে।

তোতা - এটা খুবই দুঃখজনক। কর্মরত প্রায় সাড়ে তিনহাজার শ্রমিক ভগ্নস্তুপের

নিচে চাপা পড়েছে দেখে সাধারণ মানুষের মাঝে পোশাক শিল্প মালিক সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। সংবাদ মাধ্যমের কিছু কুরুচিপূর্ণ প্রতিবেদনের কারণে এই বিরূপ ধারণা এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে পুলিশ শেষ পর্যন্ত ভবন ও কারখানা মালিকদের জেলহাজতে পাঠাতে বাধ্য হয়।

আতর - উদ্ধার কাজ শেষ করতে টানা বিশদিন লেগেছে। উদ্ধার কাজের গতি বেশ স্লথ ছিল।

তোতা - শতকরা প্রায় সত্তুরজনকে জীবিত আর বাকিদের মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও উপকরণের অভাবে উদ্ধার কাজের গতি একটু স্লথ ছিল। বিদেশিদের কাছ থেকে এসব হাতিয়ার ধার করা যেত তবে এতে দেশের ভাবমূর্তি ভয়ানক ক্ষুন্ন হতো। টিভিশোতে পন্ডিতজনের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এর থেকে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালানো হলে যারা জীবিত উদ্ধার পেয়েছে তাদের অনেকেই মারা যেত। তাছাড়া, ভগ্নস্তুপের নিচে দীর্ঘকাল জীবিত থাকার বিরল কৃতিত্বে যারা দেশ ও বিশ্ববাসীর অভিনন্দন লাভ করেছে ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। বিজ্ঞজনের অনেকেই মনে করেন যে, বর্তমান সরকার প্রধানের যুগান্তকারি নেতৃত্বের কারণে এই উদ্ধার কাজ সুচারু রূপে সফল হয়েছে।

আতর - উদ্ধার কাজের ডামাডোল শেষ হতেই স্তম্ভ রচনা আর গোলটেবিল আলোচনা শুরু হয়েছে। সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য এর দরকার আছে তবে আলোচনার বিষয়বস্তু বহুতলভবন নির্মানের কলাকৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

তোতা - পোশাক শিল্প, বিশেষ করে, বিদেশি ক্রেতাদের মনোভাব ও আচরণ নিয়েও কিছু আলোচনা হয়েছে। পোশাক শিল্প মালিকদের দেশপ্রেম ও শ্রমিকদের আত্মত্যাগের বিষয়ে কেউ তেমন কথা বলেন নি। শ্রমিক কল্যাণে অর্থ সরবরাহের জন্য তৈরি পোশাকের বিক্রি দাম কিঞ্চিত বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিকরা যে, সানন্দে তাদের টিফিন বরাদ্দ থেকে সরকারি দলের স্থানীয় কর্মীদের রামদা-ফেন্সিডিল-বিয়ার সরবরাহখাতে প্রতিদিন জনপ্রতি পাঁচটাকা করে চাঁদা দিয়ে থাকেন, সে বিষয়ে কেউ আলোকপাত করেন নি। তাছাড়া, বিদেশি ক্রেতারা পোশাকের সেলাই মজুরি বাবদ যে মূল্য নির্ধারণ করে, তার বড় একটা অংশ শ্রমিকেরা মালিক কল্যাণে ভর্তুকি হিসাবে দান করেন। পন্ডিতজনে আলোচনা থেকে এ বিষয়েও কোন উপাত্ত বা বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।

আতর - তবে ভবনধসে সরকারের তরফ থেকে হতাহত শ্রমিকদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

তোতা - বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারপ্রধান নিজ দায়িত্বে এই ত্রাণ সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। পোশাক শিল্পের মর্যাদা অন্যান্য শিল্পের অনেক উর্দ্ধে। প্রচলিত শ্রম বা দুর্যোগ ক্ষতিপূরণ আইন এই শিল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়। পোশাক শ্রমিক স্বেচ্ছায় অন্যদের তুলনায় বেশি সময়ধরে কাজ করেন, স্বল্পহারে মজুরি নেন ও কমদিন মাতৃত্বকালীণ ছুটি ভোগ করেন। প্রচলিত শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণ গ্রহন তাদের জন্য মানহানিকর।

আতর - কিছু সংখ্যক শ্রমিক যে এই পেশায় থাকবে না বলে জানিয়েছে।

তোতা - ভবনধসজনিত মানসিক আঘাতের কারণে অনেকের মনেই বৈকল্য দেখা দিতে পারে। অনেকেই হয়তো গ্রামে ফিরে গিয়ে হাঁস-মুরগি-ছাগল-ভেড়া পালনে মনোনিবেশ করবে। ফলে পোশাক শিল্পে একটা ধস নামতে পারে। তবে এতে বিচলিত হলে চলবে না; দেশের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য সবাইকে এসব বিপর্যয় হাসিমুখে মেনে নিতে হবে।

২৩ মে ২০০১৩

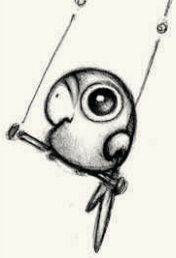

তোতা কাহিনী ১৩

এক ব্যক্তির বাড়ির পাহারাদাররা ফুলের একটা বাগান করল আর দেশের লোক তাদের খুব সুখ্যাতি করল

পাঠশালার পাহারাদার লোকটা বড়ই অলস। সে সারাদিন শুধু বসে থাকে; অন্য কোন কাজকর্ম করে না। আতর আলি বিরক্ত হয়ে তাকে বলল "খেলার মাঠের পাশের এই জমি চাষ করবে আর ফুলের বাগান করবে। আমি এখানে একটা সুন্দর ফুলের বাগান দেখতে চাই।" তোতা আতর আলিকে বলল "কাজটা মোটেই ঠিক হল না।" আতর আলি বলল "কেনো, এতে কী অসুবিধা?" তোতা বলল "একব্যক্তির বাড়ির পাহারাদাররা ফুলের বাগান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তার হাল কী হয়েছিলো সেই গল্প বলছি শোনো।" এই বলে তোতা তার কাহিনী শুরু করল-

এক দেশে এক অবস্থাপন্ন কৃষক ছিল। বেশ বড়সড় একটা ভিটায় সে বসতবাড়ি তৈরি করল। আর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করল। অচিরেই দেখা গেল একজন মাত্র লোক দিয়ে সার্বক্ষণিক পাহারা দেওয়া সম্ভব হয় না। এরজন্য কমপক্ষে তিনজন লাগে। তবে এদের প্রত্যেককে সপ্তাহে অনন্ত একদিন ছুটি দিতে হয়। অসুখবিসুখের কারণে দুএকজন মাঝেমধ্যে কাজে আসতে পারেনা। তাছাড়া নানাবিধ জরুরি কারণে ছুটি দিতে হয়। এসব বিবেচনা করলে আরও একজনকে দলে রাখতে হয়। এছাড়াও এদের তদারকির জন্য একজন লোক থাকা দরকার। একুনে পাঁচ জন লোক নিয়োগ দিতে হয়। ঐ কৃষকের সম্পদের অভাব ছিল না, তাই এরকম একদল রক্ষী নিয়ে জাঁকজমকের সাথে বসতবাড়ির পাহারা চালিয়ে যেতে লাগল।

এরমধ্যে, গেরস্ত বাড়ির সীমানা বরাবর উঁচু প্রাচীর তুলল। যাতায়াতের জন্য এর একদিকে থাকল প্রধান ফটক অন্য দিকে একটা খিড়কিদুয়ার। পাহারাদাররা তখন নতুন সিসটেম দাবি করল। তারা বলল, প্রতি শিফটে নয়জনের একটা দল লাগবে। দুজন থাকবে ফটকে, দুজন খিড়কিতে, দুজন বামপাশ দিয়ে বাড়ির সীমানা বরবর টহল দেবে; অন্য দুজন টহল দেবে ডানপাশ দিয়ে। আর একজন হবে এই আটজনের সরদার। তিন শিফটের জন্য এরকম তিনটে দল লাগবে। এদের ছুটিছাটার সময় কাজ করার জন্য বাড়তি কয়েকজন লোক দরকার হবে। গেরস্ত বেশ বুঝতে পারল যে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হচ্ছে তবে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবার ভয়ে এত রাজি হয়ে গেল। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে মহাসমারোহে গেরস্তের বাড়ি পাহারা চলতে থাকল। তবে এর খরচ যোগাতে তিনি দিন দিন কাতর হতে থাকলেন।

পাহারাদাররদের মহাস্ফূর্তি। তারা কাজের সময় কাজ করে; অন্য সময় তারা খায়দায়, বাঁশি বাজায় আর শরীরচর্চা করে। একদল যখন ডিউটিতে থাকে অন্য দুদলের তখন অবসর। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য তারা ফটকের কাছে একটা ফুলের বাগান করা শুরু করল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই চমৎকার একটা দেখার মতো ফুলের বাগান গড়ে উঠল। বাগানটা এতই সুন্দর হলো যে পাড়াপড়সিরা এমনকি আশপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা সকালবিকেল বাগান দেখতে আসতো। বাগান দেখে তারা এর প্রশংসা করত। সারা দেশে এই বাগান আর এই পাহারাদারদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এতে পাহারাদারদের উৎসাহ বাড়তে থাকল। ক্রমে তারা পুরো ভিটা জুড়ে মস্তবড় একটা ফুলের বাগান তৈরি করল। আর এটাকে একটা দর্শনীয় জায়গাতে পরিণত করল।

দূরদূরান্ত থেকে দলেদলে লোকজন বাগানে বেড়াতে আসা শুরু করল। পাহারাদাররা এদের পরিচর্যা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করল। আহার-পানীয়র জোগান দিতে থাকল। এমনকি তাদের যাতায়াতে বন্দোবস্ত করতে লাগল। এক কথায়, পাহারাদারদের সাইড বিজনেসের রমরমা শুরু হলো। বেচারা গেরস্ত পরিবার পরিজন নিয়ে বসতভিটার এককোণে কাঁচুমাচু করে বাস করতে লাগলেন আর পাহারাদার ও ফুলবাগানের খরচ জুগিয়ে চললেন। ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে তিনি বিকল্প কিছু করার সাহস পেলেন না।

২০ জুলাই ২০১৩

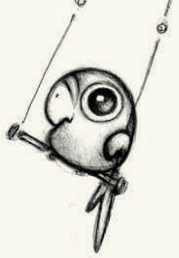

তোতা কাহিনী ১৪

জনৈক মোল্লা নারীকে গেরস্থালী কাজে নিযুক্ত থাকার পরামর্শ দিল, এতে নারীরা রাগ করলেন আর পন্ডিতেরা উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভ লিখতে লাগলেন

আতর আলি ভয়ানক চিন্তায় পড়েছে। জনৈক আধপড় মোল্লা দেশের সব নারীকে লাখাপড়া পরিত্যাগ করে আরও বেশি পতিব্রতা হতে ও একান্তভাবে গেরস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকতে পরামর্শ দিল। আধপড় মোল্লা এরূপ পরামর্শ দিতেই পারে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু দেশের নারীনেত্রীগণ ও বাঘা বাঘা পন্ডিতেরা কেউই মোল্লাকে এক কথায় খারিজ করলেন না। তারা সকলেই বিশদ বিশ্লেষণ ও গভীর গবেষণা করতে লাগলেন আর নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে লাগলেন। এই বাক বিতন্ডতার তোড়ে আধপড় মোল্লা মহামহোপধ্যায়ের আসনে প্রতিষ্ঠা পেল। আতর আলির ভয় হল, মেয়েরা সত্যি সত্যি যদি লেখাপড়া বাদ দেয় তাহলে তার পাঠশালা অচল হয়ে যেতে পারে। তখন তার জীবিকা নিয়ে টানাটানি পড়বে।

তোতা আতর আলিকে বলল - মোল্লা যা বলেছে তা সবারই জানা কথা। লোকলজ্জার কারণে কেউ তা উচ্চারণ করে না।

আতর আলি - মোল্লা বলেছে, পোশাক শিল্পে শ্রম বেচার চেয়ে গেরস্থালী কাজ অনেক ভালো। গেরস্থালী কাজের জন্য লেখাপড়া জানার তেমন দরকার নেই। সে আরও বলেছে, বয়স নির্বিশেষে সব পুরুষই একটু ললচ স্বভাবের হয়ে থাকে। নারীর চেহারা দেখলে তাদের লালসা জাগ্রত হয়। সবাই এসব কথার প্রতিবাদ করছে।

তোতা - কেউই আসলে প্রতিবাদ করছে না। মোল্লা নতুন কিছু বলেনি। তার বক্তব্যে নারীর বিপক্ষে বেশি কিছু নেই। তবে মোল্লার কথা অমলে নিলে স্বার্থহানি ঘটে তাই সবাই বাক্যজাল বিস্তার করছে।

আতর আলি - তা কেন হবে?

তোতা - বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে পোশাক শিল্পে নারী অতিমাত্রায় নিগৃহীত হয়। নারী শ্রমিক খুব কমহারে মজুরি পায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য নারী শ্রমিককে অবাঞ্ছনীয় পন্থায় অর্থ উপার্জন করতে হয়। তাছাড়া নানাদেশে এখন গেরস্থালী কাজকে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন চলছে।

আতর আলি - কিন্তু নারী লেখাপড়া করার দরকার নেই কেন?

তোতা - গেরস্থালি পেশার জন্য লেখাপড়া জানার তেমন দরকার নেই। আসলে নিয়োগ পাওয়ার জন্য আজকাল কোন পেশাতেই আর লেখাপড়ার দরকার হয় না। নারী পুরুষ কারোর জন্যই দরকার নেই। আজকাল নিয়োগ হয় কোটা ভিত্তিক। নিয়োগ পাওয়ার জন্য লেখাপড়া নয় বরং প্রবেশমূল্য লাগে। বেতন বহির্ভুত আয় যেখানে যত বেশি প্রবেশমূল্যের হার সেখানে ততো উচ্চ। গেরস্থালী কাজে নারীর কোটা শতকরা একশ ভাগ। এখানে কোন কম্পিটিশন নেই। হবুবরের আর্থসামাজিক প্রতিপত্তির উপর প্রবেশমূল্য নির্ভর করে। যৌতুক হিসাবে তা দিতে হয়।

আতর আলি - নারী যদি অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত না থাকে তাহলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রবৃদ্ধি স্লথ হয়ে পড়বে; জাতীয় আয় কমে যাবে।

তোতা - গেরস্থালী কাজকে মজুরিভিত্তিক কাজ হিসাবে গণ্য করলেই হয়। এই কাজের জন্য নারীকে উচিৎহারে মজুরি দিলে আর কোন সমস্যা থাকে না। তাছাড়া, প্রবৃদ্ধি কমে গেলে তাতে নারীর কী ক্ষতি? তারা এমনিতেই অধস্থন অবস্থায় থাকে। ঘরেরকাজ বাইরেরকাজ দুই বোঝাই তাদের টানতে হয়।

আতর আলি - তবে মোল্লা কথাগুলো তো নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ।

তোতা - মোল্লা পুরুষ মানুষ; তার কথা নারী বিদ্বেষী হতেই পারে। তবে যতটা নারী বিদ্বষী তার থেকে বেশি দেখানো হচ্ছে। এতে পুরুষের স্বার্থ রয়েছে। এরা চায় নারী কম মজুরিতে বাইরে কাজ করুক আর বিনা বেতনে ঘরে কাজ করুক। এতে পুরুষের মহা সুবিধা। তাদের কর্তৃত্বও থাকল আবার রোজগারও থাকল।

আতর আলি - মোল্লা সাহেব যে নারীকে এতসব পরামর্শ দিচ্ছে তার কারন কী?

তোতা - কারণ হলো, মোল্লা ধারণা নারীর চেহারা দেখলে পুরুষের ললসা জেগে ওঠে; ঘরে থাকলে নারী একটু নিরাপদে থাকবে।

আতর আলি - এই বক্তব্যের তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ দেখছি না। এ নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই।

তোতা - উচ্চবাচ্য করলে অসুবিধা আছে। পুরুষের ক্ষমতা কাটছাঁট করা আর তার চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপের দাবি উঠতে পারে।

আতর আলি - নারীরা বলতেই পারে যে, তারা বাইরে কাজ করবে না। শুধু ঘরে কাজ করবে, এরজন্য উচিৎ মজুরি দিতে হবে। পড়াশোনা করা তদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এরসাথে চাকরির কোন সম্পর্ক নেই।

তোতা - এর রেশ ধরে তারা যদি বলে, পুরুষরা জাতিগতভাবে লুচ্চা স্বভাবের, এদেরকে বেঁধেছেদে রাখা দরকার, তাহলে বেশ চমৎকার হয়।

২৬ জুলাই ২০১৩

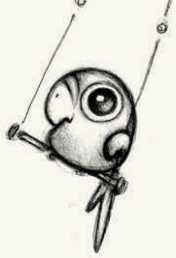

তোতা কাহিনী ১৫

উচ্চপদস্থ এক সরকারি কর্মকর্তা গরু উপঢৌকন পেলেন আর দেশ থেকে উৎকোচ প্রথা রহিত হল

ভাটিরাজ্যে কিছুকাল যাবত সরকারি দপ্তরে উৎকোচ প্রথার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এ নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ রকম পরামর্শ দিচ্ছে, কিন্তু কেউ কোন সুরাহা খুঁজে পাচ্ছে না। বেশিরভাগ রাজকর্মচারী নিজেরা উৎকোচ গ্রহণের কথা স্বীকার করেন না; তারা বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য কিঞ্চিত নগদনারায়নের দরকার হয়। অন্য অনেকেই বলে থাকেন, আক্রার বাজারে সভ্যভব্যভাবে চলতে গেলে শুধুমাত্র বেতনের টাকায় কুলিয়ে ওঠে না; সেবাভোগীর কাছ থেকে একটু আধটু অর্থানুকূল্য গ্রহণ করতে হয়। আবার কেউ কেউ এক পর্দা চড়িয়ে মত জাহির করেন যে, সরকারি কর্মচারীগণ দস্তুরমতো নগদ কড়ির বিনিময়ে পদ হাসিল করেছে; সেবাভোগীর ষোলআনা লাভে কিঞ্চিত বখরা কর্তন করলে তাতে অন্যায় কিছু হয় না।

রাজকর্মচারীগণের উৎকোচগ্রহণ বিষয়ক গুঞ্জন ক্রমেই এত বাড়তে লাগল যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার উপক্রম হল। অতিষ্ট হয়ে রাজামশাই এক গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। আতর আলি এই বৈঠকে যোগ দেবার আমন্ত্রন পেয়েছে। তাই সে তোতার সাথে সলা পরামর্শ করতে বসল।

তোতা আতর আলিকে বলল-

এককালে একদেশে সরকারি কর্মচারীগনের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণের প্রথা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সরকারের যতগুলি মন্ত্রনালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর ছিল আর এতে যতজন কর্মচারী ছিল, তারা প্রত্যেকেই উৎকোচ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করত। উৎকোচ ব্যতীত সরকারি কোন নথি নড়াচড়া করত না; উৎকোচ না পেলে কেউ কোন নির্দেশ নির্দেশনা দিত না। তবে এ বিষয়ে কোন রূপ উচ্চবাচ্য করা অত্যন্ত গর্হিত বলে গণ্য হত। কেউ কোন অভিযোগ করলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা হতো আর তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হতো।

ঐ দেশে এক সচিব রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে একখন্ড জমি ক্রয় করেন আর সেই জমিতে একটা বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। স্পষ্টতই, সচিবমহোদয়ের বেতনবাবদ আয় দ্বারা জমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্মাণ ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব ছিল না। ফলে দেশের দুর্নীতি দমন কমিশন এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করল। তদন্তের ফলাফলে দেখা গেল যে, সচিব মহোদয়ের বিয়ের সময় তার শ্বশূরমাতা কন্যা

সম্প্রদানের সাথে একটা গাভীও দান করেছিলেন। গাভীটা প্রতিবছর একটা করে বাছুর প্রসাব করত আর প্রতিদিন কয়েক লিটার করে দুধ দিত। সচিবমহোদয় গরুর দুধ আর বাছুর বিক্রি করে অনেক টাকা সঞ্চয় করেন। আর এই টাকা দিয়ে জমি কেনেন ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ামাত্র দেশের লোক সবাই সচিবকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সরকারি কর্মচারীগণ একযোগে উৎকোচ প্রথাকে না বললেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক করলেন যে, তাদের কেউই আর কখনই কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহন করবেন না; রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানের জন্য সেবাভোগীর কাছ থেকে তারা কেবলমাত্র মাপসই গোবৎস উপহার হিসাবে গ্রহণ করবেন। ঐ দিন থেকে ওই দেশে উৎকোচ প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত পেল।

তোতার কথা শুনে আতর আলি খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর বলল - এই ব্যবস্থাটা এদেশে চলানো যেতে পারে। রাজামশাই একটা ডিক্রি জারি করলেই হয়। তবে তার আগে, কোন সেবার জন্য কোন মাপের গরু লাগবে তার একটা নির্ঘণ্ট তৈরি করতে হবে। পন্ডিতরা গবেষণা করে নিশ্চয় এটা তৈরি করতে পারবে।

তোতা বলল - সেই সাথে, গরুর অভাবে ছাগল দিয়ে কাজ চলবে কি না সেটাও পন্ডিতেরা গবেষণা করে দেখতে পারেন।

১০ আগস্ট ২০১৩

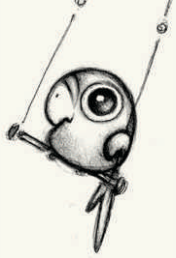

তোতা কাহিনী ১৬

সরকারি দলের সাংসদগণ স্বল্পকালে প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করলেন আর অনেকের নিন্দাভাজন হলেন

পাঁচবছরমেয়াদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠান হয়ে ভাটি রাজ্যের অতিমন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী আর সাংসদগণ স্বল্পকালেই বিপুল পরিমান বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে পড়লেন। এঁদের সকলেই ছিলেন সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি। বিনয়বশত বিত্তবৈভব গরিমা লোকসমক্ষে জাহির করেন নাই। তবে পুনরায় নির্বাচনকালে আইনজনিত কারণে সকলেই নিজস্ব ও পারিবারিক সম্পদের খতিয়ান প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকেরই ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমা আছে, শহরে জোড়ায় জোড়ায় অট্টালিকা আছে আর গ্রামে বিশাল বিশাল কৃষি খামার আছে। আগেরবার যখন নির্বাচনে নেমেছিলেন তখন এঁদের এই পরিমান সম্পদ ছিল না। এই খবর চাউর হলে অনেকেই এঁদেরকে ট্যারাচোখে দেখতে লাগল আর তিরস্কার করতে লাগল।

এই প্রসঙ্গে তোতা মন্তব্য করল - ক্ষমতাসীনদলের সাংসদগণের সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করা আদৌ সমীচীন নয়।

আতর আলি - কেন, এতে অন্যায় কী হল?

তোতা - বহুবিদ কারণে এটা অন্যায্য। প্রথমত, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা অপ্রতুল ও একপেশে। এখানে শুধুমাত্র নবনির্বাচনে আগ্রহী সাংসদগণের সম্পদের খতিয়ান নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে আগ্রহী নয় আথবা অন্যান্য পেশার ব্যক্তি, যেমন- আমলা, পুলিশ, সাংবাদিক, ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার বা শিল্পপতির মজুত সম্পদ সম্পর্কিত কোন তথ্য বিবেচনায় আনা হয়নি। তাই, ক্ষমতাসীনদলের সাংসদগনের সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য আসলে পক্ষপাত দুষ্ট।

আতর আলি - বুঝলাম; কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি কী?

তোতা - দ্বিতীয় কারণ হল, ক্ষমতাসীনদলের সাংসদগণের প্রতি বিদ্বেষবশত দুমুখো আচরণ করা হয়েছে। প্রায়শ দাবি করা হয় যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য দল ও ব্যক্তির চিন্তায় ও কাজে অবশ্যই গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রকাশ দেখাতে হবে। বলা হয়ে থাকে, দল বা ব্যক্তি যদি গণতন্ত্রের চর্চা না করে তাহলে তারা কখনোই দেশে গণতন্ত্র কার্যকর করতে পারে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সংক্ষিপ্ত সময়ে ভাটিরাজ্যকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার এই সাংসদগণ যখন ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে স্বল্পকালে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করার পথ প্রদর্শন

করছে। ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা ও কাজে এরা যখন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করছেন তখন আবার এঁদের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে।

আতর আলি - স্বল্পকালে সম্পদ সংগ্রহে এঁদের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য।

তোতা - এঁদের প্রত্যেকেই যথেষ্ট বিজ্ঞ ও দক্ষ। দেশের লোক এই বিচক্ষণতা ও সক্ষমতার কারণে নির্বাচনের মাধ্যমে এঁদেরকে সাংসদ হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। জনগণের হিসাবনিকাশ খুবই স্বচ্ছ আর পোক্ত। তারা ভুলভ্রান্তি একটু কমই করে। সাধারণ মানুষ যাদের উপর আস্থা রাখে তাদেরকে সন্দেহ করার অর্থ হল জনগণের রায় নাকচ করা।

আতর আলি - এটা অতি পরিস্কার যে, এই বিচক্ষন ও কুশলী সাংসদগনের প্রতি আস্থা রাখলে সকলেই ব্যক্তি ও প্রবার পর্যায়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে পারবে আর ভাটিরাজ্য অচিরেই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

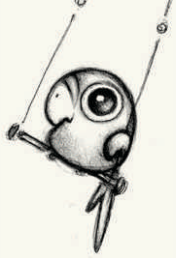

তোতা কাহিনী ১৭

এক গৃহস্থের বাড়িতে একই রাতে দুই দল তস্কর হানা দিল আর তারা নিজেদের মধ্যে কলহ করল

ভাটিরাজ্যে একগ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে একরাতে দুই দল তস্কর ডাকাতি করতে এল ও পরস্পরের মুখোমুখি হল। এ রূপ ঘটনা সচারচর ঘটে না। তস্করদল সাধারণত খোঁজখবর নিয়েই আসে। ডাকাতিকালে একদল আরেকদলের মুখোমুখি হতে চায় না। এরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে এক দল বা উভয়দলই অকুস্থল থেকে প্রস্থান করে। এক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম হল। মুখোমুখি দুই দল পরস্পরের সাথে কলহবিবাদ শুরু করল। এই সুযোগে গৃহস্থ বাড়ি থেকে বের হয়ে পাড়াপড়শিদের ডেকে আনল। তারা তস্করদের ঘেরাও করে বেশ উত্তম-মধ্যম দিল আর তাদেরকে সেপাইদের কাছে সোপর্দ করল।

সকালের কাগজে ঘটনার বিবরণ পড়ে আতর আলি বলল - তস্করগুলো নেহাতই অর্বাচীন, আর গেরস্থের ভাগ্য খুবই প্রসন্ন।

তোতা বলল - সব ক্ষত্রে এমন হয় না। অনেক সময় এ ধরণের ঘটনায় গ্রামবাসীরা বেশি ভুক্তভোগী হয়।

আতর আলি বলল - সে কী রকম?

তোতা বলল - শোনো তাহলে-

এককালে একদেশে ঠগি ও তস্করের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তস্করদল গড়ে ওঠে। তারা ছিঁচকে চুরি, রাহাজানি ও ছোটখাটো ডাকাতি করত। ধীরে ধীরে তাদের শক্তি বাড়তে থাকে। তারা কৌশলী হয়ে ওঠে। শেষে, তারা মিলেমিশে বড় দুটো দলে পরিনত হয়। এই দুই দলের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ ছিল। তবে এ নিয়ে তারা বেশি বাড়াবাড়ি করত না। তাদের ভয় ছিল, পরস্পর কলহ-কোন্দলে জড়িয়ে পড়লে দেশের লোক হয়ত তাদের ঝাড়েবংশে নির্মূল করে ফেলবে। তাই তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে লুঠতরাজ চুরিডাকাতি করত।

এই তস্করের দল রাজার শান্ত্রিসেপাইদেরও হাত করে ফেলে। বখরা আর মাসোহারা পেয়ে শান্ত্রি-সেপাইরা মহা সন্তুষ্ট। তারা এই তস্করদের কাজকারবার নির্বিঘে করার জন্য ব্যবস্থা করত। দরকার হলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন ঠগিদের শায়েস্তা করত। ক্রমে ক্রমে তস্করদের কারবার একেবারে ঝুঁকিহীন আর অতিশয় লাভজনক হয়ে উঠল। তাই দেখে, দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবি-ব্যবসায়ী-

শিল্পপতি-ডাক্তার-উকিল-সাংবাদিক হয় এই দল নাহয় ঐ দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ল।

এই কারবার বেশ ভালোই চলছিল। তবে, শেষে কী যেন হল; হঠাৎ দুই দলের মধ্যে কলহ দেখা দিল। তারা হানাহানি শুরু করল আর তা ক্রমেই বাড়তে থাকল। দাঙ্গাফ্যাসাদে মানুষজন মরল, বাস-ট্রাক-লঞ্চ পুড়ল, বাড়ি-ঘর-দোকান ভাংচুর হল। দেশের চলাচল ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ল; কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল; হাটবাজার অচল হয়ে থাকল। এই বিপাকে, শান্ত্রিসেপাইদের বখরা-মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেল - তারা পাইকারি হারে পাবলিক পেটাতে লাগলেন। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের আমদানি-রফতানি কমে গেল - তারা দেনদরবার শুরু করলেন। দিন-আনি-দিন-খাইদের আয়রোজগার বন্ধ হল - তারা অন্য ধান্দা খুজতে লাগলেন।

আতর আলি প্রশ্ন করল - দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থা কী হল? তারা কী করল?

তোতা - তারা আবার কী করবে; তারা দুই তস্কর দলের কাছে আকুল আবেদন করতে লাগল, দুই দল যেন নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় আসে আর আগের মতোই শান্তিপূর্ণভাবে লুটতরাজ শুরু করে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

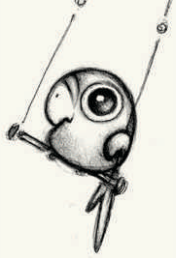

তোতা কাহিনী ১৮

নির্বাচনের বছর দুই রাজনৈতিক মোর্চা গণতন্ত্র প্রসারে উচ্চকিত হল এবং লগুড় হাতে একে অপরের সাথে মারামারি শুরু করল

হরেক রকম পালপার্বণের দেশ ভাটিরাজ্য। এখানে মৌসুমভিত্তিক উৎসব হয়। তবে নির্বাচন উৎসব হয় পাঁচবছর পরপর। এই উৎসব একএকবার একএক রূপ ধারণ করে। এবারের নির্বাচনে ক্ষুদ্রবৃহৎ দলগুলো দুই পক্ষে ভাগ হয়ে মোর্চা বেঁধেছে। দুই পক্ষই গণতন্ত্র প্রসারে শোরগোল তুলেছে। আর এই কাজে সফল হওয়ার জন্য লগুড়হাতে একে অপরের সাথে মারামারি শুরু করেছে। এদের হানাহানিতে দেশজুড়ে হরতাল অবরোধ চলছে। গাছ কাটা পড়ছে রাস্তা বন্ধ হচ্ছে। ককটেল বোমা ফুটছে অফিস আদালত বন্ধ থাকছে। বাস-ট্রাক-ট্রেনে আগুন জ্বলছে - ছেলেমেয়েনরনারী পুড়ে মরছে। বিরোধীদল হুমকি দিচ্ছে; সরকারদল আইন দেখাচ্ছে। পুলিশ পাইকেরি হারে পাবলিক ধরে হাজতে পুরছে। আরা দেশের তাবৎ সুধীজন টেলিভিশনের টকশোতে লাগাতার তর্কবিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে।

আতর আলি - দুই পক্ষই তো গণতন্ত্র চাচ্ছে তাহলে বিবাদের বিষয়বস্তু কী?

তোতা - গণতন্ত্রের রকমফের আছে। এক সময় এদেশে মৌলিক গণতন্ত্র চালু হয়েছিল। তখন নেতৃবর্গের ধারনা ছিল, দেশের লোক মূর্খ আর অর্বাচীন; এরা গণতন্ত্র বা নির্বাচন ভালো বোঝে না। এদেরকে গণতন্ত্র শেখানো আবশ্যক। তাই গণতন্ত্রের মূল উৎপাটন করে সাধারণ মানুষের নাকের ডগায় মুলা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই মৌলিক গণতন্ত্র বেশিদিন চলে নি। দেশের মানুষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে মৌলিক গণতন্ত্র ভন্ডুল করে দিয়েছিল। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে। দেশের লোক শিক্ষাদীক্ষায় অনেক উন্নতি করেছে। এখন সরকারদলের নেতারা মনে করছে, যৌগিক গণতন্ত্র বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আতর আলি - যৌগিক গণতন্ত্র আবার কী?

তোতা - এটা অতিআধুনিক ও উন্নতমানের প্রাচ্যদেশীয় গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় সকলে মিলেমিশে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। এর উপকারিতা অনেক। এতে বিবাদ-বিসম্বাদ কম হয়; সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করা যায় - কারণ নির্বাচনের দিন ভোটদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে না আসলেও চলে।

আতর আলি - এতে বিরোধীদলের আপত্তি কেন?

তোতা - বিরোধীদল যৌগিক গণতন্ত্রে সহমত; তবে তারা কিঞ্চিত শঙ্কার মধ্যে আছে। তাদের ধারণা ভাগবাঁটোয়ারায় কারচুপি হতে পারে। এতে স্বীয় দায়িত্ব পলেনে সরকার বা বিরোধী দল বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

আতর আলি - সরকারদল ও বিরোধীদলের দায়িত্ব কী?

তোতা - প্রাচ্যদেশীয় গণতন্ত্রে বহুসংখ্যক দল নির্বাচনের জন্য নিবন্ধন নেয় ও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। সাধারণ মানুষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগনের মধ্য থেকে সাংসদ নির্বাচন করেন। সরকারদল ও এর সাংসদগনের প্রধান দায়িত্ব হল, ট্যাক্স বাড়ানো, সেবা কমানো, নিয়োগবাণিজ্য পরিচালনা করা, চাঁদাবাজীতে সহায়তা দেওয়া, লাইসেন্স-পারমিট বণ্টন করা, আমালা-কামলার উপর হম্বিতম্বি করা, বিদেশভ্রমণ করা, সংসদে গলাবাজী করা ও দলনেতার তোয়াজ করা। এছাড়াও, অপরাধ দমন, ব্যাংক জালিয়াতি, মুদ্রাস্ফীতি বা ভবনধ্বস প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করা এদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হয়।

আতর আলি - বিরোধীদলের দায়িত্ব কী?

তোতা - বিরোধীদলের দায়িত্ব খুবই স্পষ্ট ও সরল। বিরোধী সাংসদের প্রধান কাজ হল গোস্বা করা, সংসদ বর্জন করা, হরতাল অবরোধ করা, জ্বালাও পোড়াও চালানো, বিবৃতি দেওয়া আর বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে ধন্না দেওয়া। তবে, সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সাংসদগণের সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সাংসদের বেতন-ভাতা বাড়ানো, ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি আমদানি করা, স্বনামে-বেনামে ঠিকেদারি চালানো আর বিদেশি ব্যাংকে টাকা পাচার করা।

আতর আলি - এখন বিষয়টা বেশ বোধগম্য মনে হচ্ছে। সরকার পক্ষ আরও একমেয়াদের জন্য স্বীয় দায়িত্ব বহাল রাখতে চাচ্ছে আর বিরোধী পক্ষ এখনই সরকার পক্ষকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছে। এই জন্য তারা একে অপরের প্রতি লগুড়হস্ত হয়েছে। তবে সুধীজনেরা লাগাতার বিতর্ক করছে কেন?

তোতা - এটাও যৌগিক গণতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় সুধিজন-হরিজন, উত্তম-অধম, জ্ঞানী-মূর্খ বা আমলা-কামলা প্রত্যেকের জন্যই পক্ষ-বিপক্ষ ও হিস্যা-বরাদ্ধ নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকের রুজি-রোজগার, বিত্ত-বৈভব, মান-মর্যাদা বা তকমা-খিলাত স্ব স্ব দলের মাধ্যমে দলনেত্রীর কাছ থেকে আসে। এখানে দলছুটরা একেবারেই অপাংক্তেয় ও দীনহীন। এই ব্যবস্থায় সুধিজনের প্রধান কাজ হল লাগাতার তর্কবিতর্ক করা এবং স্বীয় দল ও নেতৃর গুন কীর্তনে যুক্তিজাল বিস্তার করা।

৪ জানুয়ারি ২০১৪

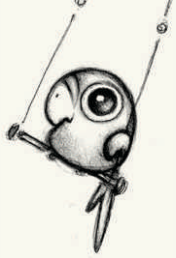

তোতা কাহিনী ১৯

রাজনৈতিক নেতাগণ উচ্চফলনশীল মৎস চাষ করলেন এবং স্বল্প কালের মধ্যেই প্রভূত সম্পদের আধিকারী হলেন

পীর-দরবেশগণ অতি উচ্চমার্গের মানুষ। এদের বহুবিধ লৌকিক ও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। প্রাচীন কালে ভাটিরাজ্যে এদের আগমন ঘটত। এরা সাধারণত উট কিংবা ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিম দেশ থেকে এ দেশে আসতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মাছের উপর সোয়ার হয়ে জলপথে অথবা খড়ম পায়ে দিয়ে আকাশ পথেও এসেছিলেন। বহুকাল যাবত এই পীরদরবেশগণের দিন গত হয়েছে। বর্তমানকালে ভাটিরাজ্যে বিদ্যমান উচ্চমার্গের মানুষের অন্যতম হল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলেও এদের অসাধারণ লৌকিক ক্ষমতা আছে। এদের সকলেই অতিশয় সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি। এরা মৃদুভাষী ও সংযতবাক। এরা ত্যাগী ও স্বল্পে তুষ্ট। এরা কখনই পর-স্বাপহরণ করেন না বা অন্যায্য আচরণ করেন না। একপ্রকার গুণাবলীর কারণে রাজনৈতিক নেতাগণ অতি সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চ আসনে আরোহণ করলেন এবং স্বল্প কালের মধ্যেই প্রভূত সম্পদের আধিকারী হলেন।

আতর আলি - রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে এইসব গুণাবলীর কথা খাটে না। রাজনৈতিক নেতারা দলাদলি হানাহানি করে থেকে। এরা নিয়োগবাণিজ্য, চাঁদাবাজী আর টেন্ডারবাজী করে। এদের অনেকেই কালোবাজারি ও চোরাচালানির সাথে জড়িত।

তোতা - এসব দুষ্ট লোকের রটনা। এসব কথা আদৌ সত্য নয়। কলিকালে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে এরূপ অপবাদ দেওয়া হয়।

আতর আলি - কী ভাবে এরা অতি অল্প সময়ে বিপুল সম্পদের মালিক হন?

তোতা - মৎস চাষের মাধ্যমে এরা এই সম্পদ সংগ্রহ করেন।

আতর আলি - গ্রামের অনেক চাষিই তো মাছের আবাদ করে। তারা তো এত সম্পদ সঞ্চয় করতে পারেনা।

তোতা - গ্রামের চাষিরা সাধারণত রোহিতবর্গের মাছ চাষ করে। এটা তেমন লাভজনক নয়। রাজনৈতিক নেতারা বিড়াল জাতের মাছের আবাদ করে থেকেন। এই মাছ কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। এই জাতের মাছ অতি উচ্চ ফলনশীল ও লাভজনক।

আতর আলি - টেলিভিশনের লাইভ ফুটেজে দেখা যায় যে রাজনোতিক নেতা সরকারি কর্মকর্তাকে চড়থাপ্পড় মারছে; জলাভূমি দখলের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বাকবিতন্ডতা করছে; পিস্তল হাতে সাধারণ মানুষকে তাড়া করছে; সংসদে দাঁড়িয়ে খিস্তি-খেউর করছে।

তোতা - প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল গণ দৃষ্টবিভ্রম বা অমূলপ্রত্যক্ষ। মানসিক বৈকল্য, বিশেষ করে, সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হলে এরকম হয়ে থাকে। অশিক্ষা, দারিদ্র ও পুষ্টিহীনতার কারণে মস্তিস্কের গঠণ ও বৈশিষ্টে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে আর এই ধরণের ব্যামো দেখা দিতে পারে। এর জন্য আশু চিকিৎসা করা খুবই জরুরি। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করলে এই রোগের প্রতিকার পাওয়া যায়।

আতর আলি - তাহলে দেশে এখন সকলের মগজ ধোলাই করার জন্য অতিসত্বর দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬ জানুয়ারি ২০১৪

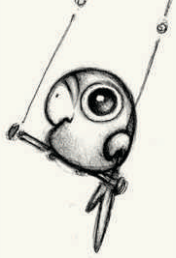

তোতা কাহিনী ২০

সংসদভবন লোহার গরাদে অন্তরাল করার সিদ্ধান্ত হল, নাগরিকবৃন্দ এর প্রতিবাদে চেল্লাচেল্লি শুরু করলেন

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বিশ্বনন্দতি সংসদভবন। বহুবর্ষ পূর্বে একজন নামজাদা স্থপতি এর নকশা করেন। জলাভূমি, বনরাজি ও সুউচ্চ দূর্গের আবহে এই ভবন নির্মান করা হয়েছিল। এটা এতো অভিনব ও দৃষ্টিনন্দন ছিল যে দুনিয়াজুড়ে এর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে সরকারি সিদ্ধান্ত হল, এই ভবন লোহার গরাদে ঘিরে দেওয়া হবে। রাজধানীর নাগরিকবৃন্দ এর প্রতিবাদে চেঁচামেচি শুরু করলেন।

সরকারি এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে আতর আলি বেশ ধন্দে পড়ে গেল। সে তোতাকে জিজ্ঞেস করল - এই যে হঠাৎ করে সংসদভবনের চারপাশে লোহার গরাদে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল, এর করণ কী?

তোতা - এটা অতি জরুরি ও আবশ্যক ছিল। দেশের সাংসদগণ এই ভবনে এসে দলনেত্রীর গুণকীর্তন করেন, নিজের কৃতিত্বজাহিরে গলাবাজি করেন, বিরোধিদলের লোকজনকে গালিগালাজ করেন আর সাধারণ মানুষের দেশপ্রেমের প্রতি সন্দেহবশত তীর্যক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন। সকলের নিরাপত্তার জন্য এঁদের গরাদের অন্তরালে রাখাই সমীচীন।

আতর আলি - তাহলে নাগরিকবৃন্দ এত চেঁচামেচি করছেন কেন? রাজধানীর ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ সকলেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই ভবনের চত্বরে হাওয়া খেতে আসেন। বিকেল হতেই ফুচকা চানাচুর বাদামওয়ালারা তাদের পসরা সাজিয়ে রাখে। যারা সান্ধ্যভ্রমনে আসেন তারা নিখরচায় হাওয়া সেবন করেন আর গাঁটের পয়সা খরচ করে চাট্টা খেয়ে থাকেন। সাংসদগণের গলাবাজি বা নিরাপত্তা নিয়ে এদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।

তোতা - নাগরিকবৃন্দ মনে করছেন যে, লোহার গরাদের কারনে তারা ভবনের চত্বরে ভ্রমণের আমোদ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই তারা এমন হট্টগোল করছেন।

আতর আলি - আসলেই কি সাংসদগণের আরও নিরাপত্তার দরকার আছে? আর এভাবে কি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়?

তোতা - সাংসদগণের বাহুবল ও অস্ত্রশক্তির যে নমুনা মাঝেমধ্যে দেখা যায় তাতে মনে হয় যে তাঁরাই অন্যের নিরাপত্তাহানীর কারণ। তবে বিষয়টা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখা দরকার।

আতর আলি - সে কী রকম?

তোতা - অতীতকালে যখন দেশে উন্নয়নের জোয়ার ছিল না তখন দেশে সাধারণ মানুষ ও সাধুসজ্জনগণ খোলামেলা জায়গায় ঘোরাফেরা করতেন; গরাদবিহীন গৃহে বাস করতেন। সেকালে চোর বদমাইশ সন্ত্রাসী ডাকাতদের বিহাইন্ডা দা বার মানে গরাদের অন্তরালে রাখা হত। এর পর উন্নয়নের জোয়ার এলো। সবাই বহুতল ভবন বানাতে শুরু করলেন। সাধুসজ্জনেরা লোহার গ্রিলের অন্তড়ালে বসবাস শুরু করলেন। আর চোরছ্যাঁচড় হাইজ্যাকার ডাকাতরা মাঠে ময়দানে ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আতর আলি - এর সাথে সংসদভবেনের গরাদে বেষ্টনির সম্পর্ক কী?

তোতা - সম্পর্ক অতি নিবিড়। সাংসদগণ যদি খোলামেলা স্থানে বিচরণ করেন আর অবারিত চত্বরে বাগাড়ম্বর করতে থাকেন তা হলে লোকজনের ধারণা হতে পারে যে তারাও চোরছ্যাঁচড় হাইজ্যাকার ডাকাতদের দলে। তাই সাংসদগণের সম্মান আর দেশের সুনাম রক্ষার জন্য তাদেরকে গরাদের অন্তরালে রাখাই শ্রেয়।

২৬ মার্চ ২০১৪

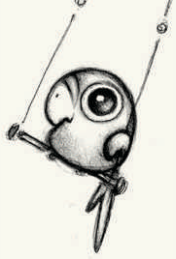

তোতা কাহিনী ২১

সুন্দরবনের এক নদীতে একটা তৈলবাহী জাহাজ ডুবে গেল, আর অমনই সারাদেশে মহা শোরগোল শুরু হল

তেলভর্তি একটা জাহাজ সুন্দরবনের এক নদী দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় ডুবে গেল। জাহাজের তেল নদীতে ছড়িয়ে পড়ল। এই খবর পাওয়ামাত্রই সারাদেশে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। টেলিভিশনে টকশো শুরু হল। পত্রপত্রিকায় স্তম্ভ রচনা হতে লাগলো। ফেসবুকে লাগাতার স্টেটাস পোস্ট হতে থাকল। এভাবে সবাই পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘোষণা দিতে লাগল আর সুন্দরবনের সৌন্দর্যহানির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। অথচ এই আক্রার বাজারে তেল কোম্পানির যে সমূহ ক্ষতি হয়ে গেলে এ নিয়ে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করল না।

আতর আলি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকল, সুন্দরবন হোক আর অসুন্দরবন হোক, নদী থাকলেই তাতে নৌকা জাহজ চলবে। আর নদীতে যদি দিনরাত গন্ডায় গন্ডায় জাহাজ চলাচল করে তাহলে তার দুচারটে তো দুর্ঘটনায় ডুবে যেতেই পারে। দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজে তেল থাকলে সে তেল তো জোয়ারভাটার টানে সবখানে ছড়িয়ে যাবেই। এ আর আশ্চর্য কি। জাহাজে চাল গম কিংবা সিমেন্ট থাকলে তা ছড়িয়ে যেতে পারতো না। জাহাজে সোনার ইট থাকলেও তা ছড়িয়ে যেত না।

তোতা - সোনার ইট সাধারণত উড়োজাহাজে চালান হয়। জলযানে সোনার ইটের চালান সম্পর্কে তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে এখানে বিবেচ্য বিষয়টা হল, মনুষ্যপ্রজাতির, বিশেষ করে, শহুরে শিক্ষিত ও চাকুরিজীবি সম্প্রদায়ের জন্য তৈল অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তৈল প্রাপ্তি ব্যতিরেকে ইনাদের কর্মে গতি আসে না। তবে, অন্যান্য প্রাণিকুলের জন্য তৈল এরূপ প্রয়োজনীয় নয়। বস্তুত, তৈলমগ্ন জলাভূমির প্রাণিকুল তৈলাক্রান্ত হয়ে মরণদশায় পতিত হয়। তৈলাক্রান্ত বনভূমির তরুকুলও ক্রমশ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

আতর আলি - তবে দুচারজন যে ভিন্ন কথা বলছেন।

তোতা - দুচারজন ভুয়োদর্শি ব্যক্তি যারা স্থলভাগে গরু ছাগল ও মনুষ্যজাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে সক্ষম হয়েছেন তারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। এদের ধারণা, তৈলাধিকার শুধুমাত্র মানবজাতির জন্য একচেটিয়া থাকা বঞ্ছনিয় নয়। জলচর, খেচর ও বনচর সকল প্রাণি, এমনকি তরুরাজিরও তৈলপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। তাই এবংবিধ দুর্ঘটনা সকলের জন্য মংগলকর। তাছাড়া, জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে। জগতের যত জলচর, খেচর ও স্থলচর প্রাণি রয়েছে, প্রত্যেকেরই একদিন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে। তৈলাক্ত অবস্থায় সুন্দরবনের বাসিন্দাগণের অকালে

প্রাণবিয়োগ ঘটলেও জগতের তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। জগত যাহারা পরিচালনা করেন তাহাদেরও কোন কেশ বিনাশ ঘটবে না।

আতর আলি - তেলবাহী জাহাজ ডুবির কারনে কিন্তু স্থানীয় লোকজনের আয়রোজগেরের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখন নদী থেকে তেল তুলছে আর তা তেল কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দু পয়সা কামায় করছে। যথেষ্ট সংখ্যক জাহাজ যদি নিয়মিত ডুবতে থাকে তাহলে তাদের এই রোজগারে সুযোগ বেশ সাস্টেনেবল হয়ে উঠবে।

তোতা - একইভাবে যদি হাইওয়েতে আলু পটল টমেটো বা চাল ডাল গমের কার্গো দুর্ঘটনায় ভেংগে পড়ে আর সেখানে যদি এই ব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে বেশ হয়। রাস্তা সাফ রাখার জন্য গ্রামের লোকেরা এসব সামগ্রী সংগ্রহ করে বেপারিদের কাছে আবার বিক্রি করতে পারবে। আর এতে পারিবারিক খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

তোতা কাহিনী ২২

উৎসবদিনে কতিপয় যুবক নারীর বস্ত্রহরণ করলো ও পতিসমাজে বহুমাত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি হল

বছরের প্রথমদিন বেলাবসানে বিপুল সংখ্যায় সুবেশ-সুসাজ নারী-পুরুষ-বালক-বালিকা উৎসবপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে আনন্দ উল্লাস করছিলেন। এ সময়ে কতিপয় যুবক কয়েকজন নারীর গাত্রবস্ত্র হরণ করলো। উৎসবপ্রাঙ্গণে মহা গোলযোগ সৃষ্টি হল। একটা পাশবিক কাজ হিসাবে এই ঘটনার সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হল, আর পন্ডিতেরা এ নিয়ে বহুমাত্রিক বিতর্ক শুরু করলেন। বিতর্ক এতই বহুমাত্রিক আর জটিল হয়ে পড়ল যে সবাই এর মর্ম উদ্ধার করতে হিমশিম খেতে লাগল। অনেকেই এ ধরণের কর্ম বিচারে নারী নির্যাতনের কোন ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা শুরু করলেন। উৎসব উল্লাসকালে নারীর সুরক্ষার দায়ভার কার উপর বর্তায় তা নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন। বর্ণাঢ্য পোশাকের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে বস্ত্রহরণ করা শাস্ত্রসম্মত কি না, অনেকে তা নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করতে লাগলেন। আতর আলি মহা ভাবনায় পড়ে গেল।

তোতা - এ নিয়ে বিভ্রান্তির কী আছে? বিষয়টা একান্তভাবেই মানবিক। প্রাণিকুলে একমাত্র মনুষ্যজাতি পোশাক পরিধাণ করে এবং শুধুমাত্র মানুষেরই গাত্রবস্ত্র মোচনের ক্ষমতা আছে। অন্য কয়েকটা প্রাণি পরিত্যক্ত বসন গ্রহণ বা ভক্ষণ করতে পারে, এর বেশি কিছু তারা পারে না।

আতর আলি - তা হলে এ বিষয়টাকে পাশবিক বলা হচ্ছে কেন? আর এ নিয়ে এত বিতর্কই বা কেন?

তোতা - মানুষও এক জাতের পশু। এরা নিজেদেরকে পশুশ্রেষ্ঠ মনে করে। তাই এ ধরণের কাজ তার পাশবিক কাজ বলে প্রচার করে। এদের ধারণা এ ভাবে বললে অন্য পশুরাও কিছুটা শ্লাঘা অনুভব করবে। তাছাড়া মানুষ খুব চিন্তাশীল জীব। এরা বাগাড়ম্বর আর তর্ক করতে ভালোবাসে। অন্য পশুরা নিজেদের সব কাজ শর্টকাটে পঞ্জিকা অনুসারে সারে আর অবসর সময়ে ঘুমায়, না হয় শুয়েবসে জাবর কাটে।

আতর আলি - এই বিতর্কের মূল বিষয়টা আসলে কী?

তোতা - মূল বিষয়টা অতি সহজ এবং সরল। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুর্লভ ও সুন্দর সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ বোধকরে আর পরস্ব অপহরণ করা এদের সহজাত প্রবৃত্তি। এই কারণে এরা হিমালয়ের চূড়োয় ওঠে, সাগর পাড়ি দেয়। পররাজ্য দখল করে সেকেন্দার আর বাবরের মত অনেক বাদশাহ ইতিহাস খ্যাত

হয়েছিলেন। কাজটা ভালো মত করতে পারলে বিখ্যাত হওয়া যায় আর তা না হলে কপালে উত্তমমধ্যম জোটে।

আতর আলি - তাই বলে পরস্বহরণ করবে?

তোতা - বিষয়টা ঠিক তা নয়। সবাই তা করে না। যারা একটু দার্শনিক টাইপের তার সব কিছুকে মায়া প্রপঞ্চ মনে করে। এরা আত্মপর ভেদাভদ মানে না। ভালো কিছু দেখলেই তা কুক্ষিগত করতে চায়।

আতর আলি - তাহলে তো বিপদ। এর যৌক্তিক সম্প্রসারণ করলে মহা ঝামেলা হবে।

তোতা - তা একটু হবে। আর একটু সম্প্রসারণ হলে দেখা যাবে যে, রেস্তরায় খাবারদাবার দেখলে এরা তা টপাটপ খেয়ে ফেলছে। দোকানে সাজানো আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রী নিজের মনে করে তুলে নিচ্ছে। এমনকি সুদৃশ্য বাড়িঘর দেখলে দখল করে নিচ্ছে।

আতর আলি - এ থেকে পরিত্রাণ নাই?

তোতা - থাকবে না কেন, আছে। সব কিছু আলকারতা দিয়ে রঙ করতে হবে। বড়িঘর রঙ করতে হবে আলকাতরা দিয়ে। পণ্যসামগগ্রী তৈজসপত্র জামাকাপড় সব হবে আলকাতরা দিয়ে রঙানো। ইচ্ছা করলে মুখেও একটু আধটু আলকাতরা মাখা যায়। প্রাচ্যদেশে কৃষ্ণবর্ণের প্রতি মানুষের গভীর অনীহা আছে।

আতর আলি - আর মানুষ যদি আলকাতরা খেতে শেখে তাহলে খাদ্যসামগ্রী নিরপদ রাখতে পারবে।

১৬ এপ্রিল ২০১৫

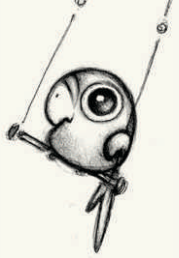

তোতা কাহিনী ২৩

জাতীয় মহাসড়কে তিনচাকারযান চলাচল নিষিদ্ধ হল, জেলা প্রশাসকগণ নসিমন-করিমন-ভটভটি হঠানো কাজে নিযুক্ত হলেন

পালাপার্বণে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার হুজুগ এদেশে অনেকদিনের। এ সময় হাজার হজার লাখ লাখ মেয়ে-মর্দ-শিশু-বৃদ্ধ বাসে-ট্রেনে-লঞ্চে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এই সুযোগে বাস-লঞ্চের মালিক আর রেলের কর্মচারি দু-পয়সা কামিয়ে নেয়। এ বছর বাস মালিকেরা যাত্রী সেবার উৎকর্ষ সাধনে পার্বণের আগেপরে দশদিন ভাড়া দ্বিগুণ ধার্য করে। বাসের সংখ্যা স্বল্পতা আর যাত্রীর সংখ্যাধিক্যের কারণে স্থানীয় তিনচাকার নসিমন করিমন ভটভটি ইসিবাইকাদি ক্ষুদ্রযান এই যাত্রী পরিবহণে যোগ দেয় আর বেশ লাভবান হয়। এতে বাস মালিকেরা গোস্বা হলেন আর সরকার বাহাদুরে নালিশ দিলেন। ফলে সারা দেশে জাতীয় মহাসড়কে ক্ষুদ্রযান চলচাল নিষিদ্ধ হল। ক্ষুদ্রযান চালকের রুজিরোজগারে টান পড়লো। তারা গোলযোগ শুরু করলো। জেলা প্রশাসকগণ এই গোলযোগ সামাল দেওয়া আর মহাসড়কে ক্ষুদ্রযান চলচাল নিবৃত্ত করার কাজে নিযুক্ত হলেন।

আতর আলি বলল - বেশ ভালোই হল, এখন নিশ্চিন্তে দুর-দুরান্তে যাওয়া যাবে।

তোতা - তুমি বছরে কয়বার দুর-দুরান্তে ঘুরতে যাও?

আতর আলি - আমি না গেলেও অন্যরা তো যায়।

তোতা - দেশের মাত্র শতকরা তেইশভাগ লোক শহরে বাস করে। এরা বছরে গড়ে একবার বা দুবার দূরে কোথাও যায়। দেশের বাকি সাতাত্তর শতাংশ লোক মফস্বলে বাস করে। হাটবাজার আর নিত্য কাজে প্রতিদিনই এদের অনত্র যেতে হয়। এদের জন্য তিনচাকার এই ক্ষুদ্রযান ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই।

আতর আলি - তিনচাকার যেসব যান জাতীয় মহাসড়কে চলে সেগুলো তো সব অবৈধ।

তোতা - তা ঠিক। আইনটা বড়ই চমৎকার। দেশে তৈরি নসিমন-করিমন-ভটভটি দেশি আইনে অবৈধ আর বিদেশ থেকে আমদানি শৌখিন বাস আর ভারি ট্রাক বৈধ। রাস্তার স্পেইফিকেশন বিবেচনা করলে জাতীয় মহাসড়কে এ সব বাস-ট্রাকের চলচল অবৈধ হওয়াই উচিৎ ছিল। তবে মালিকেরা বেশ প্রভাবশালী। তারা সুবিধামতো আইনকানুন তৈরি করে নিতে পারে।

আতর আলি - তা ঠিক। সাবেক আর হালের মন্ত্রী সাংসদ সচিব সামরিক অফিসার পুলিশ ব্যবসাইয়ী সিনেমার ভিলেন চোরাকারবারি দাগিআসামিরা বাস্ট্রাকের মালিক। এদের কথা ঠেলা দুঃসাধ্য।

তোতা - জীবিকার থেকে জীবন বড়। শ্বাপদসংকুল বনে ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী প্রাণি নাগালের মধ্যে ক্ষুদ্রপ্রাণি পেলে, তাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে। অনুরূপ, ক্ষুদ্রযান মহাসড়কে চললে দুর্ঘটনার শিকার হয়। ক্ষুদ্রযানের চালক-যাত্রীর জীবন রক্ষার্থে মহাসড়কে এর চলচল নিবৃত্ত করা সরকারের দায়িত্ব।

আতর আলি - এখন বিষয়টা স্পষ্ট হল। এইজন্যই জেলায় জেলায় ডিসি ভাইজানদের মহাসড়ক থেকে নসিমন-করিমন-ভটভটি হঠানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাক, এতো দিনে ইনারা একটা কাজের মতো কাজ পেলেন।

৯ আগস্ট ২০১৫

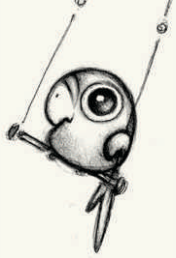

তোতা কাহিনী ২৪

চৌর্যকর্মে ধৃত শিশু জবানবন্দি আদায়কালে লাঠ্যাঘাতে মারা গেল, দেশের লোক বিচলিত হল

মফস্বলের এক শহরে এক পাহারাওয়ালা চুরির অপরাধে এক শিশুকে পাকড়াও করে ও খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের জন্য শিশুটিকে উপর্যুপরি লাঠ্যাঘাত করা হয়। শারীরিক দুর্বলতাহেতু শিশুটি মারা যায়। এই চোরমারা সভায় উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি ঘটানার সচলচিত্র ধারণ করে ও তা আন্তরর্জালে প্রকাশ করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনার সচিত্র বিবরণ প্রকাশ হওয়ামাত্র দেশজুড়ে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। সকলেই ঐ পাহারাওয়ালা আর জবানবন্দি আদায়ে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনে সোপর্দ করার দাবি জানাতে লাগলো। তবে হৈ চৈ এর মূল বিষয়টা যে কী তা আতর আলি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

আতর আলি - একজন শিশু কি চোর্যকর্মে জড়িত হতে পারে না? অপরাধ করলে শিশুকে কি পাকড়াও করা যাবে না বা তার জবানবন্দি নেওয়া যাবে না? দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই শিশু। এদের অপরাধ যদি ধর্তব্যের মধ্যে না আনা হয় তাহলে দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তোতা - আইনের চোখে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বা শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই সমান। তবে শিশুর অপরাধ বিচারে দেশে ভিন্ন আইন আছে। এই আইন তেমন প্রয়োগ হয় না। এ ক্ষেত্রে শিশুটি স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির নিপীড়নে মারা গেছে বলে হৈ চৈ হচ্ছে। তাছাড়া তাকে খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল আর তাকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

আতর আলি - শিশুর কাজে গাফিলতি পেলে তাকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখার চল এদেশে আছে। সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ এ ধরণের কাজ করে। সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ পেলে মৃদুভর্ৎসনা করা হয়। তবে গরুবাঁধা দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা ঠিক হয় নি। মনেহয়, পাহারাওলার কাছে হাতকড়ি ও দন্ডবেড়ি ছিল না।

তোতা - স্বীকারোক্তি আদায়ে রিমান্ডে নেওয়া বা দোষীব্যক্তিকে লাঠ্যাঘাত করা আইনত জায়েজ আছে। তবে শর্ত হল, দোষীব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকতে পারবে না ও এ বিষয়ে কোন তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাবে না। সাধারণত, নির্জন প্রকোষ্ঠে এই কার্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যর্ত্যয় ঘটেছে। তাছাড়া, রিমান্ড সংক্রান্ত জটিলতার করণে দোষীব্যক্তি আত্মহত্যা করে বা

হার্টফেল করে। অনেকেই আবার ক্রসফায়ারে মারা যায়। সর্বসমক্ষে স্বীকারোক্তি আদায়ের কাজ চলছিল বলে শিশুটি আত্মহত্যা করতে পারলো না বা হার্টফেল হল না। আর পাহারাওয়ালার কাছে বন্দুক ছিল না; তাই সে ক্রসফায়ারে মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হল।

আতর আলি - মফস্বলের ছোট বাজারে নির্জনে রিমান্ড পরিচালনা করার সুযোগসুবিধা নাই। স্থানীয় পাহারাওয়ালার জন্য এই ধরণের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে শিশুটি যে চুরি করেছিল তার প্রমাণ কেউ হাজির করে নি।

তোতা - পাহারাওয়ালা যখন পাকড়াও করেছে তখন ঐ শিশু আইনত শতকরা একশ দশভাগ দোষী। পাহারাওয়ালা মুখের কথাই যথেষ্ট; অন্য প্রমাণের দরকার হয় না। আইনের লোকের অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অপরাধিদের ধরে বিচারে সোপর্দ করে অথচ প্রমাণের অভাবে আদালতের আদেশে এরা দিব্যি ছাড়া পেয়ে যায়। এই জন্যই দেশে এত বিশৃঙ্খলা।

আতর আলি - রিমান্ড আর ক্রসফায়ারের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না। এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। দেশে আইনের শাসন কায়েম করার জন্য স্থানীয় পাহারাওয়ালা আর মাতব্বরের হাতে এই ক্ষমতা থাকা দরকার।

৩১ আগস্ট ২০১৫

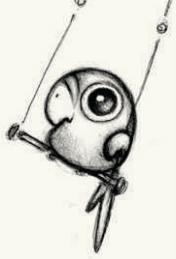

তোতা কাহিনী ২৫

সরকার উচ্চশিক্ষা সেবামূল্যে মূসক আরোপ করল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণের মনে ক্ষোভ সঞ্চার হল

কালক্রমে ভাটিরাজ্যে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভইয়েরই চাহিদা ব্যাপক বিস্তার লাভ করল। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা লাভের প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। শিক্ষা লাভের জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বিস্তর অর্থ ব্যয় শুরু করল। শিক্ষাবাণিজ্য লাভজনক হয়ে উঠল। আর এই চাহিদা মেটানোর জন্য দেশে হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। দেশের আনাচে কানাচে ইস্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরপুর হল। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এহেন একত্রবাস পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে বা মানবসভ্যতার অন্য কোন কালে দৃষ্ট হয় নি। আমতাবস্থায় অর্থ মন্ত্রীমহোদয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবামূল্যে মূসক আরোপ করল। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণের মনে ক্ষোভ সঞ্চার হল। আতর আলিও কিঞ্চিত বিমর্ষ হল।

আতর আলি - ব্যাপারটা ঠিক ন্যায় সংগত হল না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিষইয়টি ঠিক অনুধাবন করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে এটা সরকারি বিশ্ববিদ্যলয়ের পড়ুয়াগণের সম্মানহানিজনক।

তোতা - তা ঠিক। তবে এটা একেবারে অন্যায্য নয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেছে বেছে মেধাবী ছেলে-মেয়ে ভর্তি করা হয়। শিক্ষা শেষে এদের মেধার তেমন বৃদ্ধি ঘটে না। এ প্লাস পাওয়া অনেক ছেলে-মেয়ে এখানে পড়াশুনা করে শেষে থার্ডক্লাস ডিগ্রি পায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত একটু কম মেধার ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয়। এখানে উন্নতমানের পড়াশুনা হয়।

আতর আলি - হ্যাঁ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসেবার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষেই মূল্য সংযোজন ঘটে।

তোতা - অতএব, বলার অপেক্ষা রাখে না যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসেবার উপর মূসক আরোপ করা ন্যায় সংগত। যেখানে মূল্য সংযোজন ঘটে না সেখানে মূসক আরোপ করা যায় না।

আতর আলি - তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যও কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। গণহারে সবাই যদি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে যায় তাহলে সকলের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা কঠিন হবে।

তোতা - সে ব্যবস্থা তো আছেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সীমিত। চাইলেই সবাই সেখানে পড়তে পারে না। তাছাড়া একেবারে শুরুতেই গেটকিপিংএর ব্যবস্থা আছে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার সীমিত সংখ্যায় লটারি মাধ্যমে বিতরণ করার ব্যবস্থা আছে। আর যারা শুরু করবে তাদের সবাইও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। তাছাড়া, আজকাল মুদিদোকানের সেলস-পারসনের জন্যও মাস্টারস ডিগ্রিধারী খোঁজা হয়। অনেকে আবার বিএ-এমএ পড়েও রিক্সা চালায়। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই।

আতর আলি - এটা একটা চমৎকার ব্যবস্থা। রিক্সা চালানোর জন্য লাইসেন্স লাগবে। আর লাইসেন্স পেতে হলে নিদেনপক্ষে বিএ পাস বাধ্যতামূলক।

তোতা - এটা করতে হলে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ যাত্রীরা রিক্সায় ওঠার আগে যেন রিক্সাওয়ালার একাডেমিক সার্টিফিকেট যেন একটু দেখে নেয়।

আতর আলি - কিন্তু বাস-ট্রাক-লঞ্চ-ড্রাইভেরদের ক্ষেত্রে কী হবে?

তোতা - এদের জন্য লেখাপড়া তেমন জরুরি নয়। এরা গরু-ছাগল আর মানুষ চিনতে পারলেই যথেষ্ট।

আতর আলি - এভাবে শিক্ষা সংকুচিত হলে উপযুক্ত রাজকর্মী কী ভাবে পাওয়া যাবে? আর যোগ্য রাজনীতিবিধ আসবে কোথা থেকে?

তোতা - রাজকর্মচারি নিয়োগের জন্য কেনাবেচার বাজার আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। সহজে শিক্ষা সনদ বা চাকরির নিয়োগপত্র কেনার সুযোগ থাকলে কর্মী নিয়োগে কোন সমস্যা হবে না। রাজনীতিবিদের জন্য বংশপরম্পরায়ে গদিনশিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছেলেমেয়েরা বিদেশ পড়াশোনা করবে আর দেশে এসে পারিবারিক পেশায় যোগ দিবে। যারা দেশে তৈরি হবে তাদের জন্য ব্যবসা-চোরাচালানি-দাংগা-মাস্তানি করে ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে রাজনীতিতে যোগদানের সুযোগ করা যেতে পারে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

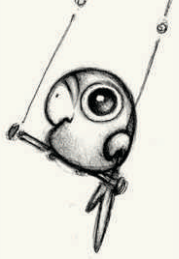

তোতা কাহিনী ২৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষকদের প্রহার করল, অনেকেই এর নিন্দা করল আর গণমাধ্যমে বহুমাত্রিক বিতর্কের সূচনা করল

এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও কতিপয় শিক্ষকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হল। এই কলহ ক্রমেই বেড়ে চলল এবং এক পর্যায়ে বিবাদমান শিক্ষকগণ উপাচার্যকে স্বীয় কর্ম পালনে বাধা দিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বেশ গোলযোগ দেখা দিল। তখন উপাচার্যের অনুপ্রেরণায় কতিপয় ছাত্র বিবাদসৃষ্টিকারি শিক্ষকগণকে প্রহার করল। সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা বহুল প্রচার পেল। আর যারা এই বিষয়ে অবগত হল তারা নানারূপ কথা চালাচালি শুরু করল। বিষয়টা আতর আলির কাছে বেশ জটিল বোধ হল।

আতর আলি - শিক্ষক গুরুজন। প্রথাগতভাবে চড়চাপড় মারা, কর্ণমর্দন করা, বেত্রাঘাত করা বা প্রহার করা একচেটিয়াভাবে শিক্ষকের এখতিয়ারভুক্ত। লঘুজন ছাত্র কি এই প্রকার কার্যের কর্তা হতে পারে? তবে উপাচার্য সর্বোচ্চ গুরু। তার অনুবন্ধে এই ধরণের কার্য সম্পাদন করলেও কি ছাত্রগণের উপর দোষ বর্তাবে?

তোতা - সামাজিক সকল প্রথাই বিবর্তনশীল। শিক্ষক সম্পর্কীয় এই বনেদি প্রথারও যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। উল্লেখিত কর্মসমূহ বর্তমানকালে আর শিক্ষকগণের একচেটিয়া অধিকারে নাই। হাল আমলে সাংসদগণ পদস্থ আমলাকে চড়থাপ্পড় মারতে পারে; উপজেলা নির্বাহী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে কানধরে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে। অনুরূপভাবে, ট্রাফিক পুলিশ রিক্সাওয়ালাকে প্রহার করতে পারে।

আতর আলি - প্রথার বিবর্তন হলেও গুরুজন লঘুজনের বিষয়টি এখনও যথাযত আছে। তাহলে উচ্চতর গুরুজনের নির্দেশে লঘুজন যদি নিম্নতর গুরুজনকে প্রহার করে তাহলে কী হবে?

তোতা - এই বিষয়ের মীমাংসা এখনও হয় নি। চপেটাঘাত, কর্ণমর্দন, বেত্রাঘাত, প্রহার প্রভৃতি কর্ম নিজ দায়িত্বে ও নিজ সক্ষমতায় সম্পাদন করা বিধেয়। অন্যের অনুরোধে বা প্ররোচনায় এরূপ কাজ করলে দোষ বর্তায়। তবে অন্যকে নিজ দায়িত্বে প্রহার করার সক্ষমতা অর্জন করা ছাত্রের জন্য চূড়ান্ত মোক্ষলাভ বিবেচনা করা যেতে পারে।

আতর আলি - সে কী রকম?

তোতা - শিক্ষকের প্রধানকাজ হল নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও সক্ষমতা ছাত্রের মধ্যে চালান করা। ছাত্র যদি নিজ দায়িত্বে অন্যকে প্রহার করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে সকল বিষয়ে তার জ্ঞান অর্জন হয়েছে; সকল বিষয়েই সে পারদর্শী হয়েছে। ছাত্রাবস্থায় যারা এই কীর্তি প্রকাশ করতে পারে তারা আসলে হীরকখন্ড। এদের গোল্ড মেডেল প্রাপ্য।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

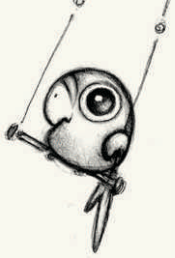

তোতা কাহিনী ২৭

শোক দিবসে কেক-প্যাস্ট্রি খওয়ার ব্যবস্থা হল; অনেকেই এতে আপত্তি করলো

শোক দিবসই হোক বা অন্য কোন দিবসই হোক, সুযোগ পেলে লোকজন উৎসব করবে। আর উৎসব করতে হলে ভালোমন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তবে আতর আলির ভিন্নমত।

আতর আলি - শোকের দিন হৈ হুল্লড় করা বা কেক কেটে উৎসব পালন করা সমীচীন নয়।

তোতা - সমীচীন নয় কেন? জাতীয় পর্যায়ে শহীদ দিবস পালন করতে গেলে উৎসবতো হবেই। আর উৎসব হলে উন্নতমানের খাবার থাকবে।

আতর আলি - মুখের ভাষা রক্ষার জন্য রাজপথে মানুষ পুলিশের হাতে রাইফেলের গুলি খেয়ে মরলো। এদের স্মরণদিনে সবাই খানপিনা নিয়ে মত্ত হবে!

তোতা - এদেশে দাবী আদায় করতে গেলে পুলিশ গুলি খাওয়ায়। এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রচিলিত। রাজপথে যারা থাকে তারাই গুলি খেতে পারে। একেবারে বিনা পয়সায় খাওয়া যায়। রাইফেলের গুলির পুষ্টিমান নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। তবে একবার ঠিকমতো গুলি খেতে পারলে মানুষ একেবারে অমর হয়ে যায়। তার আর কখনই কোন কিছু খাওয়ার দরকার পড়ে না।

আতর আলি - বেশ বোঝা যাচ্ছে। পুলিশ জনগণের বন্ধু। রাজপথে দাবীদার মানুষের অন্নচিন্তা চিরস্থায়ী সমাধান করে দেয়।

তোতা - বিষয়টা এরকমই। এককালে সবাই খেটেখুটে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে; এখন একে সিন্দুকে তালাচাবি দিয়ে নিরাপদ রেখে একটু ইংরেজি-বাংরেজি রপ্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আতর আলি - তাছাড়া টেঁকে কিছু কড়ি জমেছে, উদরে একটু মেদ লাগানো দরকার। এরজন্য শোকোৎসবে কেক-প্যস্ট্রিতো চাই-ই।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

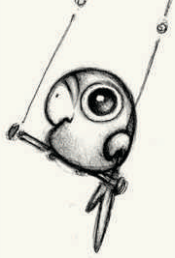

তোতা কাহিনী ২৮

ফুটপথে মোটরগাড়ি রাখলে গাড়িওয়ালাকে গাছে বেঁধে রাখা হবে; নগরপতি ঘোষণা দিলেন আর দেশের লোক ধন্য ধন্য রব তুললো

শহরের মোটরগাড়ি চলকেরা ভয়ানক পাজি। তারা যত্রতত্র গাড়ি রাখে। এমন কি ফুটপথ দখল করেও গাড়ি রেখে দেয়। এতে নগরবাসী, বিশেষকরে, পথচারীরা খুবই অসুবিধায় পড়ে। সমস্যা নিরসনে নগরপতি ঘোষণা দিলেন যে, ফুটপথ জুড়ে মোটোরগাড়ি রাখলে গড়ির মালিককে গাছে বেঁধে রাখা হবে। এই ঘোষণা কার্যকর করলে দৃশ্যকল্প কেমন হবে তা ভেবে আতর আলি অস্থির হল।

আতর আলি - গাড়ির মালিককে বাঁধা হবে, না কি চালককে বাঁধা হবে? মালিকের আদেশে চালক যদি গাড়ি ফুটপথে তোলে তাহলে মালিককেই ধরা উচিৎ। আর মালিকের অজ্ঞাতে চালক যদি এ হেন কর্ম করে তাহলে মালিককে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে মীমাংসা করা বা সঠিকভাবে কে দোষী তা নিশ্চিত করা কঠিন হবে।

তোতা - এ ক্ষেত্রে দুজনকেই বাঁধা উচিৎ, কারণ দুষ্টু চালককে নিয়োগ দেওয়াও এক ধরণের অপরাধ।

আতর আলি - এ বিষয়ে নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ করা হবে কি?

তোতা - না করাই উচিৎ। নারী ও পুরুষ উভয়কে একই মাপকাঠিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয়।

আতর আলি - একজন সমভ্রান্ত নারী গাড়িচালককে পথপাশে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে - ব্যাপারটা বেশ চিত্তাকর্ষক হবে। তবে শহরের পথপাশে যথেষ্ট সংখ্যায় গাছ আছে কি না তা শুমারি করে দেখতে হবে।

তোতা - তা-তো বটেই।

আতর আলি - আর এক কথা, কিভাবে বাঁধা হবে তা-ও বিবেচনা করা দরকার। কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধার চলই সব থেকে বেশি। হাতে বা পায়ে দড়ি দিয়েও বাঁধা যেতে পারে। তবে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা বোধহয় সমীচীন হবে না। এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মোটকথা, এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন হবে।

তোতা - তা ঠিক। তবে নগরপতির এই ঘোষণার উৎস কিন্তু বহুমাত্রিক।

আতর আলি - সে কি রকম?

তোতা - শহরের ফুটপথগুলো হকার, দোকানদার আর পথপাশের বাড়িওয়ালারা দখল করে রেখেছে। এরা খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। এদের সহসা হঠানো সম্ভব হচ্ছে না। সেই তুলনায় মোটরগাড়িওয়ালারা বেশ নরম প্রতিপক্ষ। এ ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরে অন্যদের ধরা হবে। আর এর অন্য মাত্রা হল, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহরে বৃক্ষ রোপনের কাজ জোরদার করা যাবে। শহর সবুজ আর সতেজ হয়ে উঠবে। উপরন্তু, গাছে বাঁধা গাড়িওয়ালা যথেষ্ট বিনোদনের উৎস হবে। দেশ বিদেশ থেকে হুড়হুড় করে পর্যটক টেনে আনবে।

আতর আলি - তাই-তো, এতো কিছুতো ভেবে দেখিনি। আমি মনে করেছিলাম নৈশভোজে খানা-পিনার পর দ্রব্যগুণের প্রভাবে নগরপতি এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে হয়তো ঘোষণা শুনবো, সংবাদ মাধ্যম কিছু কারসাজি করে তাঁর বক্তব্য প্রচার করেছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

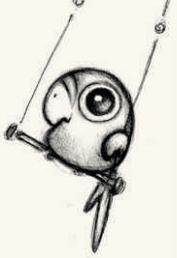

তোতা কাহিনী ২৯

হুকুম হলো স্কুল পালানো ছাত্রছাত্রীকে রাস্তায় দেখলে কয়েদ করা হবে; জাতি গঠনে রাজার সেপাইগণের দায়িত্ব বাড়লো

ভাটিরাজ্যের উজান প্রদেশে হুকুম জারি হয়েছে যে, স্কুল চলাকালে কোন ছাত্রছাত্রীকে পথেঘাটে ঘোরাফেরা করতে দেখলে রাজার সেপাই তাকে কয়েদ করবে। সম্প্রতি এই সমাচার গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এর সত্যতা এখনও নিরূপণ কারা যায় নি। এ বিষয়ে অভিভাবকগণের মতামত কী তা-ও জানা যায় নি। আর সেপাইগণ এই দায়িত্ব পালনে ইতিমধ্যে কতটুকু তৎপর হয়েছে, সে বিষয়েও কোন সংবাদ এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশ পায় নি। তবে আতর আলি এ নিয়ে খুবই চিন্তায় আছে।

আতর আলি - খবরের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল ফাঁকি দিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশ এক মহাসংকটের মুখোমুখি।

তোতা - সমস্যা একটা আছে, তবে তা অন্য রকমের।

আতর আলি - একটু খোলসা করে বলো।

তোতা - দেশে সব কিছুতেই উন্নতি হয়েছে। রুজি-রজগার ও বিত্তবৈভব বেড়েছে। বাড়ি-গাড়ি-পথ-ঘাট-বাজার সুরম্য হয়েছে। খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ আর সাজসজ্জা খোলতাই হয়েছে। সেই সাথে চোর-বাটপাড়-খুনি-ছিনতাইকারিরাও জোয়ারের জলের মতো ধনে-জনে-মানে বেড়ে উঠেছে। এরা এখন সাধারণ সেপাইদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। সেপাইরা তাই এখন আর তাদের কর্ম তৎপরতা দেখাতে পারছে না। ট্যাক্সের টাকায় সেপাই পালা হয়, এরা যদি কাজ না দেখাতে পারে তাহলে বড়ই বিপদ।

আতর আলি - তাই বলে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ধরে কর্ম তৎপরতা দেখাবে?

তোতা - কিছুদিন আগে হুকুম হয়েছিলো, সূর্যডোবার পরে সেপাইরা রাস্তায় নারীপুরুষের জোড়া দেখলে তাদের ধরবে আর বিয়ে দিয়ে দেবে।

আতর আলি শুনেছি সেপাইরা এই কাজটা শুরু করেছিলো কিন্তু বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেনি।

তোতা - পারে নি বলেই তো এখন স্কুলের ছেলেমেয়েদের টার্গেট করা হয়েছে। এদের বয়স কম; আর অভিজ্ঞতাও নেই। এখনও এরা ফাঁকিবাজির কৌশল রপ্ত করে উঠতে পারে নি। স্কুল ফাঁকি দিয়ে পথে বের হলে অবশ্যই সেপাইএর হাতে ধরা পড়বে।

আতর আলির মাথায় অন্য এক চিন্তার উদয় হলো।

আতর আলি - আচ্ছা, পেটের পীড়ার কারণে কেউ যদি স্কুল চলাকালে পথে হেঁটে বাড়ি ফিরতে থাকে সেপাইরা কি তাকেও কয়েদ করবে?

তোতা - অবশ্যই। আইনের প্রয়োগ ভিআইপিদের জন্য ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আতর আলি - তাহলে তো কয়েদখানায় পীড়া সংক্রান্ত উপসর্গাদির জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এরজন্য নীতিমালা থাকা বঞ্ছনীয়।

তোতা - নীতিমালা অবশ্যই থাকবে। আমাদের আইন প্রণেতারা শুধু যে গ্রামে-গঞ্জে রিলিফের চাল-টাকা-ঢেউটিন বাটোয়ারা করান তা নয়; তাঁরা আইন প্রণয়নেও বেশ দক্ষ।

আতর আলি - এতে ছাত্রছাত্রীদের তেমন বাড়তি কোন আসুবিধা আমি দেখছি না। স্কুলগুলোর এখন যা অবস্থা তাতে জেলহাজত বোধকরি এদের জন্য ভালোই হবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

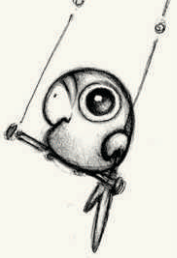

তোতা কাহিনী ৩০

বালক বালিকার বিয়ের জন্য আইনে বিশেষ ব্যবস্থা হলো অনেকে খুশি হলেন, অনেকেই আবার বেজার হলেন

বিশেষ সুবিধাবলে বালক বালিকার বিবাহের সুযোগ রাখার জন্য ভাটিরাজ্যে আইন জারি হলো। অনেকেই বেশ খুশি হলেন; আবার কেউ কেউ এতে নাখোশ হলেন। তবে আইনের প্রয়োগ কিরূপে হবে তা নিয়ে আতর আলির মনে সংশয় দেখা দিলো।

তোতা - এতে সংশয়ের কিছু নাই। এই আইন ভাটিরাজ্যে বেশ কাজে লাগবে। এর মাধ্যমে শিশু অধিকার আইনের কিছু ঘাটতি দূর করা যাবে।

আতর আলি - সে কেমন?

তোতা - শিশু অধিকার আইনের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা বঞ্চিত হয়। যেমন, শিশু ভোট দিতে পারে না। সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না। আইন সম্মতভাবে বিয়ে করতে পারে না। এই আইনের ফলে অন্তত একটি ক্ষেত্রে হলেও শিশুর বঞ্চনা কিছুটা লাঘব হবে।

আতার আলি - তা ঠিক। আজকাল শিশুরা জাতিসংঘে ভাষণ দেয়; ছায়া সরকার গঠণ করে; সরকারের বার্ষিক বাজেট বিশ্লেষণ করে। অথচ বিয়ে করার সুযোগ পায় না। এটা এক ধরণের বঞ্চনাই বটে। তবে বিশেষ সুবিধাবলে শিশুর বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা কি গণতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ?

তোতা - ভাটিরাজ্যে একটা চমৎকার গণতন্ত্র জারি আছে। এই তন্ত্রে ভিআইপি প্রাণিবাচ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। শিশুর মধ্য অনেক মেধাবী শিশু আছে। এরা অকালেই বিএ-এমএ-পিএইচডি জ্ঞান লাভ করে ফেলে বা নাচ-গান-অভিনয়ে অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ করতে পারে। এদের জন্য বিশেষ সুযোগ থাকা উচিৎ।

আতর আলি - তবে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানির বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার।

তোতা - এই আইন রচনাকালে এই বিষয়গুলি বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আদেশের দুর্বলচিত্ত অভিভাবকরা যৌন হয়রানির ভয়ে অল্প বয়সেই মেয়ে শিশুর বিয়ে দিয়ে দেয়। এটা ঘোর ন্যায়। কারণ, ঘটনা ঘটার আগেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এই আইনের ধারা খুবই স্বচ্ছ। ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে, তারপরই ধর্ষকের সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে। এর সুবিধা

অনেক, জেলে রেখে পাবলিকের ট্যাক্সের পয়সায় ধর্ষককে মোটাতাজা করার দরকার হবে না। সরাসরি সংসারে কয়েদ করা হবে। সারা জীবনের জন্য সশ্রম কারাদন্ড খেটে খাও আর বউকে খায়াও।

আতর আলি - ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে না। তবে একটা জটিলতা দেখা দিতে পার। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে হিসাব মতো একাধিক পুরুষের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হতে পারে।

তোতা - এ বিষয়ে এই আইনে স্পষ্ট করে কিছু বলা নাই। তবে এদেশে মাতৃ আদেশে বউ ভাগাভাগি করার নজির রয়েছে। হাল জামানায় বিচারকের আদেশে বউ ভাগাভাগি হতেই পারে।

৩ মার্চ ২০১৭

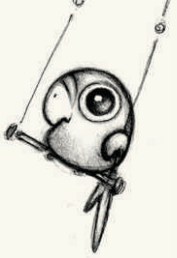

তোতা কাহিনী ৩১

দৈনিক পত্রিকায় পাঁচ কলামব্যাপী শিরোনামে জঙ্গি তান্ডবের খবর প্রকাশ পেলো - সাধারণ পাঠক এর মর্ম উদ্ধারে গলদঘর্ম

দৈনিক পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র-আনসার বচসায় জঙ্গিরা ছাত্রের পক্ষ নিয়ে আবাসিক এলাকায় তান্ডব করলো আর কাঁদানে গ্যাস ও জলকামানের আক্রমনে ছত্রভঙ্গ জঙ্গিদের সাথে পুলিশ সমঝোতা করলো। এই বিচিত্রমাত্রিক সংবাদ পাঠ করে আতর আলি ধন্ধে পড়ে গেল।

তোতা - এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। এখন হেঁজিপেঁজিরা পত্রিকার সম্পাদনা করে না - বিখ্যাত লেখকেরা এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এদের কল্পনার দৌড় আর লেখনীর জোর সুদূরপপ্রসারী। তবে দৈনিক পত্রিকার মাত্র পাঁচ কলামে আস্ত একটা উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এখানে তাই ছোটগল্প থাকে - কিছুটা লেখা, বাকিটা বুঝে নিতে হয়।

আতর আলি - সশস্ত্র আনসারের সাথে ছাত্রটির বচসা হয়েছিলো, নাকি নিরস্ত্র নিরাপত্তা কর্মীর সাথে ধাক্কাধাক্কি হয়েছিলো, তা বোঝা গেল না।

তোতা - সশস্ত্র আনসার না নিরস্ত্র নিরাপাত্তা কর্মী - এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সিনেমার কাহিনীতে এক পলকেই এক রূপ থেকে আর এক রূপে চলে যায়। বিনোদনের জন্য এটা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই নিরাপত্তা কর্মীরা খুবই করিৎকর্মা। প্রাচীন কালের সাধুবাবাদের মতো। এর দৃষ্টিশক্তি দিয়েই মানুষের গায়ে ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে - মারধর করা লাগে না।

আতর আলি -আর এই গায়ের ব্যথাও মারাত্মক ধরণের। এতে 'ইন্টার্নাল অর্গান ইনজুরি' বা 'ফ্রাকচার' থাকে না তবে হাসপাতালে চকিৎসার জন্য যেতে হয়।

তোতা - আর দেখেছো, হাসপাতালগুলো কেমন দানশীল হয়ে গেছে। আগে টাকা আদায়ের জন্য লাশ আটকিয়ে রাখতও তারা কেমন দিব্যি চিকিৎসা দিয়ে রোগী ছেড়ে দিচ্ছে।

আতর আলি - দেখা যাচ্ছে জঙ্গিদেরও বিবর্তন হয়েছে। আগে তারা রেস্তরায় ঢুকে ছাত্র-ছাত্রী খুন করতো, ব্যাংকের টাক লুঠ করতো, আর পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে প্রাণ হারাতো। এখন তারা ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে রাস্তায় সাইনবোর্ড ভাংছে আর এটিএম বুথে ফুলের টব ভাংছে।

তোতা - এই বসন্তকালে ফুলের টব ভাঙ্গা কিন্তু তাদের উচিৎ হয় নি।

আতর আলি - তবে কাঁদানে গ্যাস আর জলকামান বেশ কাজের মনে হচ্ছে। এর কারণেই তো জঙ্গিরা ছত্রভংগ হয়েছে আর সব পক্ষ সমঝোতায় এসেছে।

তোতা - সেই সাথে আবাসন কতৃপক্ষ ছাত্রদের দাবীগুলো মেনে নিয়েছে।

আতর আলি - ছাত্রদের দাবী যে ঠিক কী ছিলো তা ঐ খবর পড়ে বোঝা যায় না।

তোতা - দাবী যা-ই হোক না কেন, তা বোধহয় অন্যায্য ছিলো না। অন্যায্য হলে আবাসন কতৃপক্ষ কখনই তা মেনে নিতো না।

৩ মার্চ ২০১৭

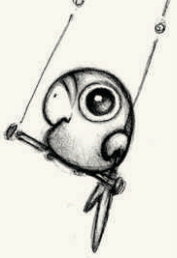

তোতা কাহিনী ৩২

এক মুদি বিক্রি না করার জন্য দোকানে পচা মাছ-মাংস জমিয়ে রাখলো ও ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা দিলো

ভ্রাম্যমান আদালত শহরের মুদি দোকানগুলোতে নিয়মিত তদারকি তল্লাশি চালায়। এই আদালত এক দোকানে অনেক পচা মাছ-মাংস পেলো। মুদি দাবি করলো যে, সে এগুলো বিক্রির জন্য রাখে নি; বরং এলাকার রেস্তরাগুলতে সুলভে সরবরাহ করার জন্যে রেখেছিলো। এতে আদালতের মন গললো না; তারা মুদিকে অনেক টাকা জরিমানা করলো। পরে জানা গেল, ঐ মুদি নিয়মিতভেবেই পচা মাছ-মাংস জমিয়ে রাখে আর নিয়মিতভাবেই জরিমানা দেয়। মুদির এই ধারাবাহিক জরিমানা দেওয়ার ব্যাপারটা আতর আলি খুব আশ্চর্য্য বোধ হলো।

তোতা - এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! মুদি বার বার পচা মাছ-মাংস রাখে, তাই বারে বারে জরিমানা দেয়।

আতর আলি - সে তো বুঝলাম। কিন্তু মুদি একই কাজ বারে বারে করে কেন?

তোতা - মাছ-মাংস পচনশীল দ্রব্য; বেশি দিন ভালো থাকে না। আর পচা বলে তা ফেলে দিলে লোকসান হয়। সব থেকে বড় কথা এতে দেশের সম্পদের অপচয় হয়।

আতর আলি - জরিমানা দিলেও তো লোকসান হয়।

তোতা - এখানেই তো মুদির বাহাদুরি। রাজার এত লোকলস্কর নেই যে প্রত্যেক দিন এসে তদারকি করবে। এরা ছয়মাসে নয়মাসে একবার আসে। আর এর মধ্য মুদি দেদারসে পচা মাছ-মাংস বিক্রি করে। তাই কালেভদ্রে দুই এক লাখ টাকা জরিমানা দিলে লাভের ভাগে তেমন একটা তারতম্য হয় না। তাছাড়া, সিস্টেমটা বেশ কাজের, সব কূলই বজায় থাকে।

আতর আলি - সব কূল মানে?

তোতা - সব কূল নয় তো কি! যে জরিমানা করে সে একটা কমিশন পায়। রাজার ঘরে কিছু টাকা আসে। আর মুদিও দিব্যি পচা মাছ মাংস বিক্রি চালিয়ে যায়।

আতর আলি - তাছাড়া, যারা স্বাদ বদলাতে চায়, তারা রেস্তরায় গিয়ে পচা মাছ- মাংস খেয়ে আসতে পারে। তবে, সাধারণ ক্রেতাদের বঞ্চনা করা হয়। তারা সরাসরি পচা মাছ মাংস কিনতে পারে।

তোতা - কথাটা ঠিক নয়। সাধারণ ক্রেতাদেরও সে সুযোগ আছে। যারা গাঁটের কড়ি খরচ করে পচা মাছ-মাংস কিনতে চাইবে, একটু ইশারা দিলেই মুদি সানন্দ চিত্তে তা সরবরাহ করবে।

২২ মার্চ ২০১৭

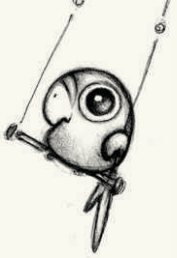

তোতা কাহিনী ৩৩

পল্লীগ্রামে গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ আইন আইন জারি হলো - দেশের মানুষ উল্লাস বোধ করলো

ভাটিরাজ্যে আইনপ্রণেতারা শুধু যে গ্রামগঞ্জে উন্নয়ন সামগ্রী ভাগাভাগি করেই ক্ষান্ত হন, তা নয়। তাঁরা দেশ ও জাতির জন্য নিয়মিত আইন প্রণয়নও করে থাকেন। সম্প্রতি তাঁরা গ্রামের সোন্দর্য বর্ধন ও কৃষি জমির সুরক্ষার জন্য গৃহনির্মান নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেছেন। এই আইনের উদ্দেশ্য, বিধেয় ও মর্মার্থ উদ্ধারে আতর আলি বিশদ বিশ্লেষণে রত হলো।

আতর আলি - এই আইন জারি করা কি খুবই জরুরি ছিলো? এতে গ্রামের মানুষের কী উপকার হবে?

তোতা - প্রচুর উপকার হবে। তবে, কথা হলো, গ্রামের মানুষের ধারণা হচ্ছিলো যে ভোট দিয়ে তারা যাদের সংসদে পাঠায়, তাদের একমাত্র কাজ হলো রিলিফের চাল-গম-ঢেউটিন-কাবিটা আর রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ-কালভার্টের ঠিকাদারি ভাগাভাগি করা। এটা যে সত্য নয় তা গ্রামের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য এই আইন জারি।

আতর আলি - হ্যাঁ, এই আইন বিশেষকরে গ্রামের মানুষের জন্যই করা হয়েছে। এর ফল তারা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

তোতা - অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষা এসব মৌলিক বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যেই অনেক আইন জারি হয়েছে। বাকি ছিলো শুধু আশ্রয় সংক্রান্ত আইন। এবার তা জারি হলো।

আতর আলি - বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই আইনের ফলে দেশের গ্রামগুলো রক্ষা পাবে। খালনদীজলাশয় ভরাট করে অট্টালিকা বানানো শুধু শহরেই চলবে; পল্লীগ্রামে তা চলবে না।

তোতা - গ্রামের মানুষ যত্রতত্র ঘরবাড়ি বানায়। তাছাড়া, তাদের বাড়িঘরের চেহারাসুরতও খুব উন্নত নয়। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

আতর আলি - বিশেষকরে, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যার সময় গ্রামের লোকেরা রাস্তার উপর, বাঁধের ঢালে আধাভাংগা সব ঘরবাড়ি তোলে। এটা খুবই বিচ্ছিরি ব্যাপার।

তোতা - এই আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ হলে এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা রোধ করা যাবে। গ্রামের সুনির্মল পরিবেশ বজায় থাকবে।

আতর আলি - তবে এই আইন মানুষ ছাড়াও অন্যান্য আবাসিক প্রাণির উপর প্রয়োগ হওয়া উচিৎ। গ্রামদেশে শিয়াল-বেজি-খরগোশ আর বাবুই পাখিও বাসা বানায়। বাবুইরা যাদি একই তালগাছে শতশত বাসা বানায় তাহলে বাসার ভারে তালগাছ তো ভেংগে পড়তে পারে।

তোতা - চিন্তার কোন কারণ নাই। দরকার হলে আইন প্রণেতারা তালগাছ রোপন আইন জারি করবে। তখন বাবুইদের জন্য দেশে তালগাছের আর ঘাটতি থাকবে না।

২৪ মার্চ ২০১৭

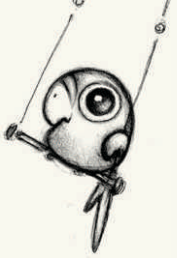

তোতা কাহিনী ৩৪

রাজার প্রহরী নিরাপত্তা তল্লাশি কড়াকড়ি করলো; হাতের থলি আর গায়ের কাপড় ছাড়াই সবাইকে উৎসবে যোগ দিতে হলো

ভাটিরাজ্যে প্রতিবছরই বছরের প্রথম দিনে উৎসব হয়। গ্রামে গঞ্জে শহরে মেলা বসে। মেলায় লাঙল-জোয়াল-নিড়ানি, দা-কুড়াল-খুন্তি আর হাড়ি-বাটি-ঘটির আমদানি হয়। মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা আর চা-পান-সিগরেটের দোকান বসে। দেশের কামার কুমোর তাঁতিরা তাদের পশরা নিয়ে আসে। বাজারের দোকানগুলোতে সাজ সাজ পড়ে। বুড়া-বুড়ি, যুবক-যুবতি, কিশোর-কিশোরী আর বালক-বালিকারা নতুন পোশাকে সাজে। আর চারুকররা শহরের সড়কে, ঘরের দেয়ালে ও মানুষের হাতে-মুখে-কপালে আলপনা আঁকে। সবাই আনন্দ ফূর্তি করে আর ঘটা করে মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দেয়।

তবে যেখানেই উৎসব আর লোক সমাগম, সেখানেই চোর, ছ্যাঁচোড়, ছিনতাইকারি ও পকেটমারের আগমন। উৎসবে এসে অনেকেই গাঁটের টাকা, হাতের বটুয়া আর গলার গহনা হারায়। এছাড়াও উৎসব প্রাঙ্গনে একদল বখাটে ছেলে ঘোরাঘুরি করে; তার মেয়েদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করে। হালে, আর এক উপদ্রব শুরু হয়েছে। জঙ্গি নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তারা বোমা-বারুদ সাথে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আর যখন তখন বোমা মেরে মানুষ মারে, সাথে নিজেও মরে। এই জঙ্গিদের হাত থেকে দেশের লোককে বাঁচানোর জন্য রাজার প্রহরীরা নিরাপত্তা তল্লাশি শুরু করেছে। প্রথম দিকে এটা তেমন জোরদার ছিলো না। তবে জঙ্গিরা ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাই নিরাপত্তা তল্লাশি কড়াকড়ি হচ্ছে। গত বছর হাতে থলি নিয়ে কেউ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারে নি। এবছর নিয়ম হয়েছে যে, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হলে হাতের থলির সাথে গায়ের কাপড়ও বাদ দিতে হবে। এসব দেখে আতর আলি উৎসবে যাওয়া বাদ দিয়ে নিজের বাসায় বসে থকলো।

তোতা - এতে বিচলিত হওয়ার কী আছে? অনেক দেশের এয়ারপোর্টে জামা-প্যান্ট-জুতো খুলে তল্লাশি করে। তাছাড়া মানুষের পোশাকের থেকে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

আতর আলি - তাই বলে নেংটো হয়ে শোভাযাত্রায় ঘুরে বেড়াবে?

তোতা - নিরাপত্তার জন্য এটা করতেই হবে। পোশাকে আড়ালে যে কেউ বোমা-বারুদ লুকিয়ে রাখতে পারে। তল্লাশির সময় সে যদি বোমা ফোটায়, তাহলে প্রহরী আর আশেপাশের লোকজন মারা পড়তে পারে। বরং এটাই ভালো। দূর

থেকেই দেখা যাবে - পরনে কাপড় নাই, সাথে বোমা নাই। সবাই নিশ্চিন্ত। তাছাড়া, পোশাক একটা সংস্কার মাত্র। এই প্রথা একবার চালু হলে সাবাই আগ্রহ করেই কাপড় ছাড়াই শোভাযাত্রায় যাবে। কাপড় পরাটাই তখন লজ্জার ব্যাপার হবে।

আতর আলি - তাই হয় নাকি কখনো?

তোতা - কেন হবে না। দেখছো না, রাজার কর্মচারী যারা ঘুষ খেয়ে বড়লোক হচ্ছে আজকাল তাদের কেমন কদর। আর দুচারজন সাধু প্রকৃতির কর্মচারী যারা আছে তারা কেমন লজ্জায় ম্রিয়মান জীবন কাটায়।

আতর আলি - একদিক থেকে ভালোই হয়। পারিবারিক বাজেটের উপর উৎসবের তেমন আছর পড়বে না। নতুন পোশাক কিনতে হবে না; টাকা বাঁচবে। পোশাকের জাঁকজমক না থাকলে দেশে একটা সাম্যভাব দেখা দেবে। তাছাড়া যেসব অভিমানী মেয়ে নতুন পোশাক না পেলে আত্মহত্যা করে তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে। তবে অন্য একটা সমস্যা দেখছি। লোকে টাকাপয়সা কিভাবে সাথে রাখবে? কেনাকাটা করবে কিভাবে? কেনাবেচা না হলে তো দেশের অর্থনীতিতে বিরাট বিরূপ প্রভাব পড়বে।

তোতা - এটা কোন সমস্যাই নয়। এটা ডিজিটাল যুগ। সকলের বায়োমেট্রিক পরিচয় আছে। সবাই ভয়েস মেইলে চাহিদা পাঠাবে আর টিপসই দিয়ে জিনিসের দাম দেব। দোকানিরা ড্রোন মারফত পণ্য ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেবে। তবে বিবেচ্য বিষয় হলো প্রহরীগণের পরনে পোশাক থকবে কিনা।

আতর আলি - তাইতো; লোকজন সব নেংটো আর প্রহরীরা ইউনিফর্ম পরে আছে - ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না। কিন্তু প্রহরীরাও যদি পোশাক ছাড়া থাকে তাহলে তাদের চিনবো কেমন করে?

তোতা - একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হতে পারে। তাদের মাথায় টুপি থাকবে; গলায় ঝোলানো থাকবে পরিচয়পত্র আর কোমরে বেল্ট। বেল্টের সাথে ঝুলবে অস্ত্র, জরিমানা আদায়ের রশিদ বই আর কলম। পায়ে জুতো থাকতে পারে, না থাকলেও আসুবিধা নাই।

১৪ এপ্রিল ২০১৭

অন্যান্য

তোরণ নির্মাণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ বিদ্যা উৎপাদন করা। অতিরিক্ত কিছু কাজও এর আছে। দেশবিদেশের মনীষীদের অনারারি ডক্টরেট ভূষিত করা এমন একটা অতিরিক্ত কাজ। লিখিয়ে, পড়িয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, আঁকিয়ে কিংবা অভিনেতা, হর পেশায় যারা দুনিয়াজোড়া নাম করেছে এমন লোকজনকে এই ডিগ্রি দিয়ে দেয়। হাল আমলে এই কাজের বিস্তৃতি বেড়েছে। আজকাল দেশবিদেশের জননেতাদের মাঝে ডক্টরেট ডিগ্রি বিতরণের রেওয়াজ বেশ চালু হয়েছে।

স্কুলকলেজে বিদ্যা উৎপাদন হয়না; এখানে বিদ্যা বিতরণ হয়। নেতা কিংবা ফলোয়ার, কাউকেই কোন ডিগ্রি এরা দিতে পারেনা। এই মনঃকষ্ট মোচনে বর্তমান-ছাত্রদের পীড়ণ আর সাবেক-ছাত্রদের সংবর্ধনা ছাড়া অন্য পন্থা সেখানে ছিলো না। সম্প্রতি তাদের সাধ পূরণের কিছুটা সুযোগ হয়েছে। এখন তারা লোকাল কৃতিসন্তান বা প্রাণপ্রিয় নেতার ভ্রমণ উপলক্ষে রাস্তার তোরণ নির্মানের এখতিয়ার পেয়েছে।

বিদ্যা বেচা টাকা আলতুফালতু খরচ না হয়ে জনহিতে ব্যয় হচ্ছে, এটা বড়ই শ্লাঘার ব্যাপার।

১৩ ডিসেম্বর ২০১১

সম্পত্তি বাঁটোয়ারা

পৈত্রিক সম্পত্তি বাঁটোয়ারা সময়মতো করে নেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয়। সাধুজনেরা এরূপই করে থাকেন ভাগবণ্টনে কলক্ষেপন করলে ভাগিদার বঞ্চিত হয়। সংসারে কলহকোন্দল সৃষ্টি হয়। মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়। এমনকি, ব্যাপারটা লাঠালাঠি ও খুন-জখম পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তাবৎ বিষয়-আসয় একা ভোগ করা সেকেলে রাজাবাদশার কাজ। এটা ঘোরতর সামন্তবাদী মানসিকতা। মোঘল যুবরাজরা এ ব্যাপারে ছিলেন ভারি কট্টর। আফগান সীমানা থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভূভারত তাঁরা একাই শাসন করতে চাইতেন। এনিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ-বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ। কালক্রমে তাঁরা সবংশ নিপাত হয়েছেন। উনারা যদি একটু রয়েসয়ে চলতেন, ভাগাভাগি করে রাজ্যশাসন চালাতে রাজি হতেন, তাহলে ভাতৃহত্যার কলংকজনক ইতিহাস হয়ত সৃষ্টি হতনা।

হালের ডিজিটাল যুগে একক ভোগদখলের থিয়োরি একেবারেই অচল। এযুগে রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে মুদিখানা পর্যন্ত সবকিছু ভাগাভাগি করে চালানো দস্তুর। মসনদ পৈত্রিক হোক বা স্বামীসূত্রেই হোক, তা ভাগাভাগি হবেই। কোন কোন দেশে যুবরাজরা পালা করে রাজা হন - এক টার্ম ইনি, আর এক টার্ম উনি। গণতান্ত্রিক দেশে এটাই প্রজা শাসণের সিস্টেম।

সিস্টেমটা চমৎকার। গণভোটে পাঁচ বছর মেয়াদে রাজা; পরের পাঁচ বছর হলিডে। তবে কর্মিষ্ঠ লোকের এই দীর্ঘ হলিডে সয়না। তাদের গাত্রদাহের কারনে মাঝেমধ্যে রাজপথে বাস-কার-ট্যাক্সি ভস্মীভূত হয়। টেম্পরাল ভাগাভাগির এটা একটা অসুবিধা। স্পেসিয়াল ভাগাভাগিতে সে অসুবিধা নাই। নগর-গ্রাম জেলা-উপজেলা দুভাগে ভাগ হবে; দুজনে শাসন করবেন। কোন ঝামেলা নাই। সবাই দিব্যি খোশহালে বাস করবে।

স্থানিক বাঁটোয়ারা কঠিন কিছু নয়। প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে মিশরের জ্যামিতিবিদরা এই কাজ অনেক করেছেন। তিনকোনা, চারকোনা, পাঁচকোনা কিংবা বৃত্তকার, সব রকমের জমিজমা ভাগ করার কৌশল আমাদের শিখিয়েছেন। শিশুকালে স্কুলে পড়ার কালে এই বিদ্যা রপ্ত করেছি। সম্পত্তির আকার আয়তন যেমনই হোক আর এর সীমানা যতই আঁকাবাঁকা হোক, ভাগাভাগি করা এখন আর কোন ব্যাপার নয়।

উত্তর-দক্ষিণ কিংবা পূর্ব-পশ্চিম একটা সরল অথবা বক্র রেখা টেনে দিলে গ্রাম হোক, শহর হোক, চাই কি একটা আস্ত রাজধানী হোক, একদন্ডে দুই ভাগ। নিমেষেই কর্ম সমাধা।

৬ ডিসেম্বর, ২০১১

বিদ্যা বিতরণ ও গরুছাগল

এককালে দেশে বিদ্যা বিতরণের অন্যতম প্রধান কৌশল ছিলো লাঠ্যৌষধ প্রয়োগ। স্কুল-পাঠশালায় গরু-ছাগল পিঠিয়ে মানুষ করা হতো। সেকালে জনসংখ্যার প্রাদুর্ভাব তেমন ছিলোনা। পাঠশালাগমনীয় মনুষ্য সন্তানের সংখ্যা ছিলো নগন্য। গ্রামের গরুছাগল ধরে এনে পাঠশালায় পাঠানো হতো। গুরু মশায় বেত্রাঘাত পদ্ধতিতে এদের মানুষে পরিণত করতেন। এটা বেশ কার্যকর পদ্ধতি। বোধকরি, এতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর বিরূপ পড়তে থাকে। পরবর্তীকালে এই কৌশলের আমূল পরবর্তন করা হয়। গরুছাগলকে মানুষ করার বদলে মনুষ্যসন্তানকে গরুছাগলে রূপান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনৈক কার্টুনিস্ট গবেষনা করে দেখিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের অধিকংশই শিক্ষাকালের সমাপনীতে সফল্যের সাথে গরুছাগল হতে পারে। বর্তমানে জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ রূপান্তরিত গরুছাগল। দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গ এবিষয়ে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। সেই করণে তাঁরা ট্রাকবাস চালককে পথঘাটে গরুছাগল সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

স্কুলকলেজের সাথে গরুছাগলের সম্পর্ক অতি নিবিড়। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় যে, গ্রামগঞ্জে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গরুছাগলের হাট বসে। এটা একটা চমৎকার সিস্টেম। এতে উৎপাদন ও বিতরণ সোপানের মধ্যে যোগসূত্র সংক্ষেপ ও দৃঢ় হয়। তাছাড়া, ছাত্রগন সরাসরি গরুছাগলের সংস্পর্শে আসতে পারে ও এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এই ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রতি বছর কোরবানির সময় সারা দেশের স্কুল-কলেজে বিরাট গরু-ছাগলের হাট বসানো হয়।

তবে, এই বিদ্যা বিতরণ ও গরুছাগলে রূপান্তর স্ট্রাটিজিতে কিঞ্চিত বাহুল্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, গ্রামীন পরিবার গরুছাগল বিক্রি করে ছেলের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করে (সচরাচর, মেয়ে সন্তানের বেলায় এটা ঘটে না)। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, গরুছাগল বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মনুষ্য সন্তানকে গরুছাগলে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় সারপ্লাস ভ্যালু তেমন ক্রিয়েট হয়না। সন্তানকে শর্টকাটে গরুছাগল বানাতে পারলে কাজটা লাভজনক হতে পারে। এবিষয়ে গবেষণা করা বিশেষ জরুরি।

৭ নভেম্বর ২০১১

যানজট নিরসন ও দেশের নিরাপত্তা

এটা আর নতুন কথা নয় যে ঢাকা শহর ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে যানজট একটা বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পন্ডিতজনেরা এ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা চালাচ্ছেন। কাগজে বিস্তর লেখালাখি হচ্ছে। টিভি টকশো আর গোলটেবিল আলোচনার হিড়িক চলছে। তবে কাজের কাজ কিছু দেখা যাচ্ছেনা। ঢাকা শহরের এবংবিধ বিকাশ কিছুতেই আর থামছেনা। এরমধ্যে কেউ কেউ ইংগিত দিয়েছেন যে, শহরের মাঝ বরাবর যে সেনানিবাস আর সীমান্ত রক্ষী ঘাটি রয়েছে তা সরিয়ে ফেললে কিছুটা সুরহা হতে পারে।

ইংগিতটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী, কিন্তু বড়ই অন্যায্য। গরিব আর ছোট দেশ বলে কি আমাদের শক্তসমর্থ ডিফেন্স ফোর্স আর সুরক্ষিত ঘাটি থাকবেনা? ছোটবড় পড়শি যারা আছে তাদের মতিগতি আমরা ঠিক জানিনা। তাদের কেউ যদি হঠাৎ এদেশের খানিকটা দখল করে নিতে চায় তাহলে কে তাদের ঠেকাবে? ডিফেন্স ফোর্সকেই তো তখন এগিয়ে আসতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী বেশি ছিলনা। বাধ্যহয়ে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী আর আনপড় চাষাভুষোদের নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধারা যার যার বাড়ি চলে গেল। তারপর গড়ে উঠল দক্ষ চৌকস বাহিনী। অনেক ঘাম আর রক্ত ঝরিয়ে এই বাহিনী চৌকসতর হয়ে উঠেছে। এরা যে শুধু যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী তাই নয়, আরো অনেক বিষয়েই করিৎকর্মা। বন্যাত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে ভোটাভুটি পরিচালনা করা পর্যন্ত সব ধরনের কাজেই এরা দারুণ দক্ষ। দেশের রাজনীতিক আর ব্যবসায়িরা যখন ফেল মারে এরা তখন অকুতোভয়ে কান্ডারি হয়ে দেশের হাল ধরে।

আজকাল টেকনোলজির অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন কোন কিছুই আর ঢাকা নয়, সবই উদ্যোম। শুধু পড়শিই নয়, দূরদেশিরাও উড়ো পথে এসে দেশ দখল করতে পারে। এই জন্য বিমান বাহিনীর ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যভালো আমাদের বিমান বাহিনী আছে। দেশের সোনার ছেলেরা আছে এই বাহিনীতে। তারা আকাশে বিচরণ করে। বিপদকালে তারাই আমাদের ঢেকে রাখবে। তাই এদের মর্যাদা উঁচুতে রাখা বাঞ্ছনীয়। মেট্রোরেল বা পুরনো সৌধের সৌষ্ঠব নিয়ে আদিখ্যেতা দেখিয়ে বিমান বাহিনীর কাজে বিঘ্ন ঘটানো সুবিবেচনা নয়। শত্রু বিমান উড়ে এসে রাজধানীতে যদি বোমা ফেলতে শুরু করে আর আমাদের বিমান যদি উঁচু দালানের ঘেরাটোপে আকাশে উড়তে না পারে তাহলে মেট্রোরেল ও সাধের সৌধ সব হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে।

একে যানজটে শহর অচল তার উপর আবার বোমা পড়ার ভয়। এমন অবস্থায় সব

থেকে সুবিবেচনার কাজ হল আগেভাগেই সরে পড়া। প্রধান মন্ত্রীর অফিস, সংসদ ভবন, আবাসিক এলাকা ও বস্তিগুলো সরিয়ে নিয়ে দূরে কোথাও বসানো যেতে পারে। সদিচ্ছা থাকলে এটা তেমন কঠিন কাজ হবেনা। ঢাকা শহর পুরোটা পেলে সেনাবাহিনী আর বিমান বাহিনী নির্ঝঞ্ঝাটে দেশ রক্ষার কাজ করতে পারবে। দরকার হলে খাল উদ্ধারের কাজ জোরদার করে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পর্যন্ত একটা জলপথের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে নৌবাহিনীর কাজে সুবিধা হবে, সেই সাথে পরিবেশবাদীরাও খুশি হবে।

এই পরিবর্তনে ক্ষতির সম্ভাবনা যৎসামান্য। খুব বেশি হলে, দুএকটা কাবাবের দোকান আর কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবসায়ে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বৃহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে হলে ক্ষুদ্র স্বার্থে কিছুটা ছাড় দিতে হবে বৈকি।

২৭ অক্টবর ২০১১

গাড়ির চাকায় দেশ চলে

লেখাপড়া শিখে মানুষ মূর্খ হয় তা অনেকেই বলে থাকেন। এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে এ সিদ্ধান্ত স্বপক্ষে প্রমাণ দিনে দিনে ভারি হচ্ছে। কথাটা যে কত সত্যি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বগুড়া আর ফরিদপুরের পরিবহন শ্রমিকরা। ডিজিটাল বাংলার মর্মার্থ ভেদ করতে সবাই গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। পন্ডিতেরা হরেক রকম থিওরি দিচ্ছিলেন। নানা মুনির নানা মত। চতুর্দিকে বাগাড়ম্বর আর ধূম্রজাল। পন্ডিতদের কান কেটে আনপড় পরিবহন শ্রমিকরা ডিজটাল বাংলার সারমর্ম এক কথায় প্রকাশ করেছে।

সভ্যতার অগ্রগতি চক্রাবত ঘূর্ণায়মান। শুরুতে ছিল ছবি আঁকা। জীবজন্তুর ছবি। এর মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান। এর মাধ্যমেই লেনদেন। তারপর লেখন এল। শিখন হল। সভ্যতা আগে বাড়ল। অগ্রগতির ধারায় ডিজটাল যুগ এসে হাজির। কালের চাকার ঘূর্ণিতে আবার সেই সূচনা বিন্দু। আবার ছবির যুগ শুরু। চলছে এ্যনিমেশনের রাজত্ব। চারিদিকে শুধু ছবি আর ছবি। হানাহানি-ভালোবাসা, বাণিজ্য-বিনোদন, রাষ্ট্রকর্ম বা ধর্মপালন সব ছবিতে প্রকাশ।

এখন বানান ব্যাকরণ বাতিল হচ্ছে। কলম-পেন্সিল যাদুঘরে যাত্রা করছে। লেখাপড়া শিখে জজ-ব্যারিস্টার হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করার জমানা এখন বিগত। আসামী খালাস করা তো দূরের কথা, উকিল-ব্যারিস্টাররা নিজেরাই আজকাল জেলহাজতে খাবি খাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলায় জীবজন্তুর ছবি আঁকতে পারলে সর্বোচ্চ ডিগ্রি; সর্বোচ্চ সম্মান। গর-ছাগল-ভেড়ার ছবি চিনতে পারলে হাতেহাত নগদ লাইসেন্স প্রাপ্তি।

বগুড়া আর ফরিদপুরের পরিবহন শ্রমিকরা ভায়া ডিসি জানিয়েছে যে কলমবাজিতে দেশ চলেনা। দেশ চলে গাড়ির চাকায়। কলমবাজরা বেশি তেড়িবেড়ি করলে চাক্কা বন্দ। দেশ একেবারে অচল।

২৮ আগস্ট ২০১১

যোগাযোগ মন্ত্রীর পদত্যাগ

কিছু লোক আজকাল যোগাযোগ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছেন। এটা অন্যায় দাবী। নিজের পা তিনি কিভাবে ত্যাগ করবেন? পা ছাড়া তিনি দাঁড়াবেন কিভাবে আর যোগাযোগই বা চালাবেন কিভাবে? তখন তাকে হয় হুইলচেয়ার কিনে দিতে হবে নাহয় সব যোগাযোগ ভার্চুয়াল করে ফেলতে হবে। আর মন্ত্রীর এই পা নিয়ে দেশের লোকের কী উপকারটা হবে!

তাছাড়া মন্ত্রীর দোষটাই বা কী? যানবাহনের মালিকরা বাতিল পুরনো ট্রাকবাস ধুয়েমুছে নতুন রং লাগিয়ে রিসাইকেল করছে। এত অনন্দের কথা। অন্যরা যখন পুরনো কাগজ রিসাইকেল করতে হিমসিম খাচ্ছে তখন আমরা আস্ত বাসট্রাক দিব্যি রিসাইকেল করে চলাচ্ছি।

দেশে হাজার হাজার গরিব যুবক আছে। এরা পয়সার অভাবে লেখাপড়া করতে পারেনি। এদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তাই তার চুরিডাকাতি না করে বাসট্রাক চালিয়ে খাচ্ছে। দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখছে। তারা গরু-ছাগল-ভেড়া চেনে। এগুলো জাতীয় সম্পদ। কখনই তারা গরু-ছাগল-ভেড়া চাপা দেয়না। আজ পর্যন্ত এরকম কোন খবর পত্রিকায় ছাপা হয়নি। তবে এ্যকসিডেন্ট ইজ এ্যকসিডেন্ট। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন গড়ে মাত্র বারোজন মানুষ মারা পড়ে। এতে কী আর এমন ক্ষতি! দেশে পনেরো-ষোল কোটি লোক রয়েছে, এর মধ্য বারোজন করে কমলেও খুব একটা ঘাটতি পড়বেনা।

যোগাযোগ মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে বিপুল পরিমান অর্থ সাশ্রয় হয়েছে সেকথা কেউ বলছেনা। তিনি পুরনো রাস্তা মেরামতে অপচয় না করে অনেক টাকা বাঁচিয়েছেন। তাইতো আমরা উড়ালপথ, পাতালরেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসের স্বপ্ন দেখতে পারছি। দেশিবিদেশি ব্যবসায়িরা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই মন্ত্রীর অধীনস্ত বিভাগ আন্তঃজেলা সড়ক দেড়মিটার কম চওড়া করে তৈরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এতে বিপুল পরিমান জমি বেঁচে গেছে। কৃষকরা ইচ্ছা করলে এসব জমিতে ধান-গম-ভুট্টা-অড়হর বা আম-জাম-কাঁঠাল আবাদ করে খাদ্য ঘাটতি কমাতে পারবেন।

এসব পজিটিভ দিকগুলো না দেখে, প্রতিদিন গড়ে বারোজন মারা যাচ্ছে এই দুঃখে বিলাপ করলে দেশের অগ্রগতি হবে কেমন করে!

২৩ আগস্ট ২০১১

মন্ত্রীভাগ্য

আমাদের মন্ত্রীভাগ্য অতিশয় ভালো। দল নির্বেশেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীগণ বেশ চমৎকার ব্যক্তি। এদের একজন অতিনির্লোভ ও ধর্মপ্রাণ। তিনি আমানতের খেয়ানত করা পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্‌কে ফেরত দেন। আর একজন ছিলেন, তিনি অতিসদাশয়। সাধারণ মানুষের মতই। তার কোন দাম্ভিকতা ছিলনা। তিনি চোরডাকাতের ভয়ে থানার দারোগার কাছে প্রোটেকশন চাইতেন। বর্তমানে একজন আছেন যিনি বড়ই পুলিসবান্ধব। তিনি পুলিশের দুঃখকষ্ট সইতে পারেন না। দেশে সন্ত্রাসের দাপটে প্রতিদিন গন্ডায় গন্ডায় পুলিশ আহত নিহত হয়; দেখে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এসব খবর ছাপেনা দেখে সাংবাদিকদের ভর্ৎসনা করেন। এছাড়াও একজন ছিলেন যিনি খুবই সজ্জন। আর করিৎকর্মাও বটে। তিনি শুল্ক বিভাগ ও প্রশাসণের লালফিতে পাশ কাটিয়ে সরাসরি আস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেন। কিঞ্চিত ভুল বোঝাবুঝি ও দলভিত্তিক রেষারেষির কারনে হালে তিনি হাজতবাস করছেন।

যোগাযোগ মন্ত্রীরাও কম মহানুভব নন। হাতে কলমে দক্ষতা অর্জনের জন্য তারা নিজের নিজের বাস সার্ভিস চালান। সেইসাথে বিআরটিসির কর্মচারীদের কষ্ট কমানোর জন্য সরকারি বাস অচল রাখেন। সরকারি বাসে মেরমত খরচ বাঁচিয়ে অর্থসাশ্রয় করেন। পুরনো সড়ক মেরামতে অযথা টাকা অপচয় করেন না। তার বদলে মিলিয়নবিলিয়ন ডলারের উড়ালসেতু পাতালরেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস সড়কের স্বপ্ন দেখান। এছাড়াও এক্সট্রা কাজ হিসাবে কয়লা কোম্পানি চালান, বিদ্যুৎপ্লান্টের ব্যবসা করেন। তিনি বড়ই অমায়িক লোক। মানুষজন তাকে গালমন্দ করলেও তিনি রাগ করেন না। সবসময় তার মুখে হাসি লেগে থাকে।

নৌপরিবহন মন্ত্রী আরো ভালো। যাত্রীসেবায় অবদান রাখার জন্য যেকোন নৌযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট তিনি অকাতরে দান করেন। নিজের কাজতো তিনি করেনই সেইসাথে সড়ক বিভাগের কাজে তিনি সাহায্য করার জন্য মটরযান শ্রমিকদের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্সও বিলি করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বেশ কাজের লোক। তিনি লাগাতার বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে চলেছেন। ব্যবসায়িরা যাতে দেউলিয়া হয়ে সবংশে উজাড় নাহয় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি।

এমন মন্ত্রীভাগ্য দেখে কিছু লোকের চোখ টাটাবে, সেটাইতো স্বাভাবিক। তবে এসব মহাপ্রাণ মন্ত্রীরা যদি মাঝপথে এসে পা হারান তাহলে দেশতো একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

২৩ আগস্ট ২০১১

ভেজাল আদিবাসী

দেড়পারসেন্ট দুপারসেন্ট লোকের জন্য বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠির অধিকার খর্ব হবে, সেটা কিছুতেই টলারেট করা যায়না। অনাদিকাল থেকে বাঙালিরা এদেশে বাস করে আসছে। তারাই খাঁটি আদিবাসী। পরবর্তী কালে হাতেগোনা দুদশজন যারা ভাগ্যের ফেরে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে তারা আদিবাসী হিসেবে গণ্য হতে পারেনা। তাদের বড়জোর ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠি বলা যেতে পারে। অথচ এরা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করছে আর দেশের বন-জঙ্গল-ঝর্না-পাহাড় সব দখল করে জুড়ে বসেছে।

এই ভেজাল আদিবাসীরা বেজায় নচ্ছার। এরা বাংলায় কথা বলেনা। বাঙালি কৃষ্টির ধারধারেনা। গভারমেন্টতো দূরে থাক মিলেটেরিকে পর্যন্ত ভয় করেনা। এরা মেরেধরে বাঙালিদেরকে পাহাড়ি এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এদের অত্যাচারে, স্বাধীন বাংলাদেশে বাসকরেও বাঙালিরা পাহাড়টিলায় বাড়িঘর বানিয়ে বাস করতে পারছেনা। বনজঙ্গল থেকে কাঠখুটো আমদানি করতে পারছেনা। বনবাদাড়ে ধানগম চাষ করে দেশের খাদ্য সুরক্ষা গড়ে তুলতে পারছেনা। এদের উচ্ছেদ করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার।

হিটলার সাহেব এটা ভালো করেই বুঝেছিলেন। খতরনাক সংখ্যালঘুদের নিকাশ করার জন্য তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ভাগ্যদোষে কাজটা পুরো করতে পারেননি। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো। এদেশ একজন শক্তসমর্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আছেন। তিনি ডিজিটাল বলে বলীয়ান। ভেজাল আদিবাসীদের শায়েস্তা করতে বেশি বেগ পেতে হবেনা।

সরকারের প্লানপরিকল্পনা বেশ সুদূরপ্রসারী। মনে হচ্ছে এই দেড়দু' পারসেন্টকে শায়েস্তা করে নয়দশ পারসেন্টদের ধরা হবে। তারপরে সরকার বিরোধি ত্রিশবত্রিশ পারসেন্টদের সাফসুতর করা হবে। এটা করতে পারলে কেল্লা ফতে। সরকার তখন ম্যান্ডেটবলে পাহাড়-জঙ্গল-নদী-নালা ইলেকশন মেয়াদি ইজারা দিতে পারবে। আর তখনি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী বাঙালি প্রকৃতভাবে দেশের মালিক হতে পারবে।

১৪ আগস্ট ২০১১

ডাকাত দমন ব্যবস্থা

নবাবী আমলে বর্গীর দৌরাত্ম্যে বাংলার কৃষক ধানে পাণে উজাড় হতে বসেছিল। নবাবের সৈন্যরা তাদের শায়েস্তা করে। এক সময় গ্রামবাংলার পথেঘাটে ঠগিদের প্রবল দাপট ছিল। তাদের অত্যাচারে হাটবাজার প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজ শক্ত হাতে ঠগি দমন করে। গত শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশের শহরগুলোতে, বিশেষ করে রাজধানী শহরে, চুরি ডাকাতি ছিনতাই চাঁদাবাজি বোমাবাজি অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। জনজীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ক্রিমিনালরা অপরাধ করে চম্পট দিত। পুলিশ তাদের খুঁজে পেতনা। দুচারজন যারা ধরা পড়ত তারাও আসাধু উকিলের যোগসাজশে জামিনে মুক্তি পেয়ে যেত। সরকার এ বিষয়ে খুব তৎপর হয়ে ওঠে ও এ বিষয়ে নতুন এক কর্মকৌশল আবিস্কার করে।

সরকার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নব আবিস্কৃত ক্লিনহার্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। কালক্রমে এই ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়। চৌকস র‍্যাব বাহিনী গড়ে ওঠে। দ্রুতবিচার পদ্ধতি প্রবর্তন হয়। ক্লিনহার্টের পরে ক্রসফায়ার, তারপরে এনকাউন্টার ইত্যাদি নব নব কৌশলের আবিস্কার ও প্রয়োগ হতে থাকে। দলসরকার সেনাসমর্থিতসরকার ও লীগসরকার তাদের কলহবিবাদ একপাশে রেখে নিষ্ঠার সাথে এই ব্যবস্থা জারি রাখে।

তবে আপরাধ দমনে কার্যকর হলেও এই কৌশল ছিল টপডাউন ব্যবস্থা। হালে ডাকাত দমনে পুলিশ নতুন এক কৌশল ব্যবহার করছে। এটা সম্পূর্ণরূপে গণমুখী। বোধকরি, এনজিও প্রবর্তিত বটমআপ বা কমউনিটিবেজড এ্যপ্রোচলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পুলিশের সাথে জনগণের বিবাদ ঘুচে গেছে। এখন পুলিশ ও জনতা এক হয়ে সন্দেহভাজন ডাকাত ধরছে আর গণপিটুনি দিয়ে ডাকাত মারছে।

অনেকেই মনে করে এ অবস্থা জারি থাকলে আশাকরা যায় দেশ অচিরেই ডাকাত মুক্ত হয়ে পড়বে। তবে, সন্দেহবাতিক কিছু লোক এটা তেমন পছন্দ করছেন না। তাদের ধারনা, এরফলে দেশে আইনশৃংখলা বলে কিছুই থাকবে না। দেশ একেবারে রসাতলে যাবে।

৫ আগস্ট ২০১১

কাদের ডাকাত

বাঙ্গালির মত হুজ্জতে জাত বোধকরি দ্বিতীয়টি আর নেই। সন্ত্রাসী লিমনের গোলযোগ শেষ হতে না হতেই কাদের ডাকাতকে নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। ঢাকা ভার্সিটিতে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞানে পড়লে যে ডাকাত হতে পারবে না এমন বিধিনিষেধ কোথাও নেই। পুলিশ যখন বলছে কাদের ডাকাত, তখন নিশ্চয় সে ডাকাত। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডাকাত।

প্রায় আড়াইশ বছর ধরে সগৌরবে এই পুলিশ শান্তিশৃংখলা রক্ষার কাজ করে আসছে। ব্রিটিশ আমলে করেছে, পাকিস্থান আমলে করেছে, বাংলাদেশ আমলেও করছে। পাবলিকের ট্যাক্সের পয়সায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত আড়াইশ বছরের বনেদি পুলিশ কিছুতেই কর্তব্যকর্মে গাফলতি করতে পারেনা। তাদের ভুল হতেই পারেনা।

কাদের যদি ডাকাত না হবে, তাহলে রাতদুপুরে সে দুদক অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল কেন? ছাত্রদের কাজ হল বেলা ডোবার সাথে সাথে যার যার ঘরে ফিরে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা। দেশে বিধান আছে বিকেল পাঁচটার মধ্যে স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতের কাজকর্ম শেষ। রাত নটার মধ্যে দোকান-পাট শপিংমল সব বন্ধ। রাত দশটার পরে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করবে শুধু চোর ডাকাত আর পুলিশ।

অনেকেই বলাবলি করছেন যে, দারোগা নাকি কাদেরকে চাপাতি দিয়ে কুপয়েছে আর গাড়িচুরি ও ডাকাতির মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে। এ ভারি অন্যায়। চাপাতির মত বেলাইসেন্স দেশি অস্ত্র ব্যবহার করা পুলিশের জন্য মর্যাদাহানিকর। দরকার হলে পুলিশ দুচার রাউন্ড গুলি চালাতে পারে। তাছাড়া, কী করে আসামীর স্বীকারোক্তি আদায় করতে হয় পুলিশকে সেই ট্রেনিংই দেওয়া হয়; নাটক নোভেল লেখার ট্রেনিং দিয়ে পাবলিকের পয়সা অপচয় করা হয়না।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরা পুলিশের আবশ্যকীয় কাজ। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কিঞ্চিত উত্তমমধ্যম প্রদান করাও বিধিসম্মত। অধিকাংশক্ষেত্রেই সন্দেহভাজন আসামী হয় দোষ কবুল করে, না হয় আপরাধজনিত আত্মগ্লানির তড়নায় গলায় গামছা পেঁচিয়ে হাজতখনার গরাদে ঝুলে ভবলীলা সাঙ্গ করে। কাদের এমন কঠিন ডাকাত যে তার কাছে তিন তিন জন জাঁদরেল পুলিশ হার মেনেছে। স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থতার এই দায় অবশ্যই ঐ তিন পুলিশকে বহন করতে হবে। সে প্রক্রিয়া অলরেডি শুরু হয়েছে। ঐ তিন পুলিশ এখন সাময়িকভাবে বরখস্ত। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে যথাসময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

এতে কিন্তু কাদেরর দোষস্খালন হয়না। কাদের যে ডাকাত তা তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সহছাত্র সবাই জানে। সহানুভূতিবশত তারা কাদেরর পক্ষে কথা বলছে

আর তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে। আইনে গেরেফতার আসামীর জামিন নেওয়া প্রকান্তরে দোষ স্বীকারেরই সামিল। দাগিচোর, খুনেডাকাত, দুর্ধর্ষসন্ত্রাসী আর শীর্ষদুর্নীতিবাজরা জামিন নিয়েই মুক্ত বিচরণ করে।

সবাই জানে, মামলা করতে বাঙালির আর জুড়ি নেই। সামান্য কথা নিয়ে ভাইপো চাচার নামে মামলা ঠুকে দেয়। হাতাহাতি থেকে খুনোখুনি, তারপরই মামলা; এত হরহামেশাই হচ্ছে। বেফাঁস কথা বললে এখন যে কেউ এসে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারে। এরজন্য ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে হালআমলের আনকোরা অনেক নতুন আইন হাতের কাছেই মজুত আছে। উকিল- মোক্তাররা এসব মামলার জন্য হাঁ করে বসে থাকে। এহেন দেশে চাপাতির কোপে রক্তারক্তি ঘটল আথচ এ্যগ্রিভড পার্টি মামলা করবে না তা বিশ্বাস করা যায়না।

কাদের যদি লায়ার না হত তাহলে লয়াররা এতদিনে নিশ্চয় তার পক্ষে এটেম্পট টু মার্ডার, মিথ্যামামলা দায়ের আর মানহানির মত ডজন দেড়েক মামলা জুড়ে দিত। আর তা যদি না হয়, তাহলে নিশ্চয় দেশে স্মার্ট লয়ারের আকাল পড়েছে!

৩ আগস্ট ২০১১

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা। তবে গনতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব ও প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে তাঁর ক্ষমতা এখন বেশ কিছুটা সীমিত। তিনি শুধু বিলে সই করেন। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় সুধিজনকে দাওয়াত দেন, খানাপিনা করেন ও ভাষন দেন। কবর স্মৃতিসৌধে ফুল চড়ান। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন করেন। অতীতকালে কাঁচিবাজি বা ফিতেকাটা কাজে তাঁর প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। হালে এই কাজ অন্যদের কাছে ডেলিগেট করা হয়েছে। তবে তিনি যুদ্ধ ঘোষনা করতে পারেন। কিন্তু কাছে বা দূরে আমাদের কোন শত্রু নেই। তাছাড়া আমাদের সেনাবাহিনী এখন ব্যবসা-বাণিজ্য কন্সট্রাকশন শিক্ষা খেলাধুলা বিনোদন নিয়ে ব্যস্ত যুদ্ধের মত কুৎসিত ব্যাপারে জড়িত হওয়ার সময় তাদের নাই।

এহেন আলংকারিক পদভার জাতির মর্যাদা যারপরনাই ক্ষুন্ন করে। দেশের লোক দেখতে চায় রাষ্ট্রপতি একজন দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও উদার ব্যক্তি। তিনি নির্বীজ বা অথর্ব নন। তাই সংবিধানবলে তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষমতা রাখা হয়েছে। তিনি যে কোন সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে মার্জনা করতে পারেন। ভ্রান্তি জনিত কারণে দন্ডপ্রাপ্ত নির্দোষ ব্যক্তির সাজা মওকুফ করলে এই বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেনা। তিনি প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটির সংশোধন করলেন মাত্র। আর নিরীহগোছের অপরাধে অল্পস্বল্প সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড রহিত কারা নেহাতই তুচ্ছ কাজ। এধরণের ছোটখাটো কাজে জড়িত হওয়া তাঁর শোভা পায়না। দুচারদশটা খুন করেছে, পাকাপোক্ত মৃত্যুদন্ডের আসামী, এমন লোককে বেকসুর খালাস দিতে পারলে তবেই না তাঁর ক্ষমতা। তবেই না তিনি বাপের বেটা।

আরো একটা বিষয় আমাদের অনুধাবন করতে হবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী, বিশেষ করে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত খুনের আসামী, সাধারণত পলাতক থাকে। সুযোগ-সুবিধার অভাবে এদের গেরেফতার করে আনা সম্ভব হয়না। এতেকরে বিচারের ফলাফল ঝুলে থাকে। হালে এমনই এক আসামী সাহস করে আত্মসমার্পন করেছ। এই সৎসাহসের পুরস্কার হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঐ আসামীর দন্ড রহিত করেছেন। এটা একটা অনবদ্য উদাহরণ।

কথিত আছে জর্জ ওয়াশিংটনে বাবা সত্য ভাষনের জন্য ওয়াশিংটনকে মার্জনা করেছিলেন। সেই হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রপতি মার্কিনদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট তথা জাতির জনকের বাপের কাজ করেছে। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শুধু বাপের বেটাই নন, তিনি মার্কিনজাতির বাপের বাপ।

২১ জুলাই ২০১১

ওয়ানস্টপ সার্ভিস

ওয়ানস্টপ বেশ চমৎকার ব্যবস্থা। হালের কনজ্যুমারইজমের যুগে এটা চালু হয়েছে। আগে ছিলনা। তখন সদাগরি বা সরকারি অফিস কিংবা ব্যাংকে গেল অন্তত হাফডজন কাউন্টারে ঘুরতে হত। এক কাউন্টারে তথ্য পরামর্শ; এক কাউন্টারে ফর্ম। আরএক কাউন্টারে যাঁচাইবাছাই। এমনিকরে হরেক কাউন্টার ঘুরে গলদগর্ম হয়ে তবেই কাজ শেষ করা যেত। অনেক ঝামেলা। অনেক সময় নষ্ট।

ব্যবসায়িরা বুঝেছেন যে ওয়ানস্টপে তড়িৎ কাজ। ফায়দা বেশি। এতে কাস্টমার খুশি। তাদের কষ্ট কমে, সময় বাঁচে। আর কর্মচারীর বেতন ষোলআনার জায়গায় আঠারোআনা উসুল। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ওয়ানস্টপের মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পেরেছেন। ক্রাইম কন্ট্রোলে এর জুড়ি নেই।

ক্রিমিনালি কাজকারবার সমাজে বেশ চালু আছে। ক্রিমিনালরা চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি বোমাবাজি করে সরে পড়ে। গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এদের ধরতে গেলে অনেক হাঙ্গামা। প্রথমে জিডি এফআইআর; তারপর তদন্ত। তদন্তের পর ওয়ারেন্ট ইস্যু। তারপরে খোঁজপাতি নিয়ে আসামী ধরা। আসামী ধরা পড়লে আরও এক ঝামেলার শুরু। কোর্টে চালান দেওয়া। সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করা। তারিখে তারিখে হাজিরা দিয়ে মামলা চালানো। এতসব কাঠখড় পুড়িয়েও অনেক সময় আসামীকে কব্জা করা যায়না। উকিলমোক্তার ধরে চোর-ডাকাতরা দিব্যি খোশহালে নিজের নিজের বাড়ি চলে যায়।

এখন আর সে দিন নাই। ক্রাইম কন্ট্রোলে র‍্যাপিড এ্যকশন আর ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু হয়েছে। এখন একবার মাত্র এনকাউন্টার। আসামী দেখামাত্রই পাকড়াও। সাথে সাথেই বিচার; তাৎক্ষনিক দন্ডপ্রদান। ক্রিমিনালদের জারিজুরি সব শেষ।

১৮ জুলাই ২০১১

রবীন্দ্রনাথ বিরল প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথ নামটা শুনলে পাকা গোঁফদাড়িচুলওয়ালা জোব্বাপরা একজন সৌমদর্শন বৃদ্ধের ছবি মনে আসে। যদিও রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজনের মতো নবজাতক হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ও শৈশব কৈশর যৌবন অতিক্রম করে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তাছাড়া আলখেল্লা তিনি ধরেছিলেন প্রৌঢ়ত্বে এসে। এর আগে তিনি নানা ধরণের পোষাক পরেছেন।

শিশুকালে তিনি মাত্র দুচার দিন স্কুলে যান। এরপর স্কুল বাদ দিয়ে গৃহশিক্ষকের সহায়তায় পড়ালেখা করেন। এভাবে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন ও বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়, এমনকি অস্তিবিদ্যাও কিছুটা অধ্যায়ন করেন। তিনি কুস্তিগিরের তত্ত্বাবধানে মল্লচর্চাও করেছিলেন। এছাড়াও ওস্তাদের কাছে সংগীতের তালিম নেন। তবে তাঁর মল্ল প্রতিভার কোন বিচ্ছুরণ দেখা যায়নি। আর পেশাদার গায়ক হিসাবেও তিনি বেশিদূর অগ্রসর হননি। ঘরোয়া বৌঠকে তিনি গাইতেন। সাকুল্যে তিন চারখান গান রেকর্ড করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অতিশয় সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। এটা তিনি নিজে নিজেই শেখেন। কবিতালেখা শেখানোর জন্য তাঁর কোন গৃহশিক্ষক ছিলনা। কালক্রমে তিনি গান, নাটক, নৃত্যনাট্য, উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখা শুরু করেন ও আজস্রধারায় লিখতে থাকেন। এমনকি, বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দতত্ত্ব ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকও রচনা করেন। বলা যেতে পারে লেখালেখিই ছিল তাঁর প্রধান পেশা। সাইড বিজনেস হিসাবে তিনি পৈত্রিক জমিদারি তদারক করতেন। শেষ বয়সে এসে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। ইউরোপ আমেরিকার কয়েকটি শহরে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। ঐসব দেশ তিনি চিত্রশিল্পী হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

তাঁর কবিতাগুলো ছিল খুবই উন্নত মানের। এর জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ও ভারতবর্ষে কবিগুরু বা বিশ্বকবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁর রচিত গানগুলো আরো অসাধারণ ও কালজয়ী। গত শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে এখন পর্যন্ত অনেক গায়ক গায়িকা রবীন্দ্ররচিত গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বাংলাদেশ ও ভারত রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয়সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেছে। পার্শ্ববর্তী শ্রীলংকার জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথের গানের আদলে রচিত।

রবীন্দ্রনাথ যে বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই প্রতিভা এতই ব্যাপক যে জন্ম নিতে তাঁর দুই দিন সময় লেগেছিল। তিনি বাংলা বর্ষপঞ্জি মতে ২৫শে বৈশাখ বাংলাদেশে ও পরেরদিন অথচ একই তারিখে পশ্চিম বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেন। এইকারণে বাংলাদেশ সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকার দুইদিনব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালণের ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেছে।

৯ জুলাই ২০১১

ম্যাচিয়ুর পার্টি

এক কথার মানুষ বলে গত বছরের মতো এবছরও বয়স বায়ান্ন বলতে হবে, এটা কৌতুকেই মানায় বাস্তবে চলেনা। তরুণ বয়সে অভিজ্ঞতা কম থাকে, বুদ্ধিবিবেচনা থাকে অপরিপক্ক। সে বয়সের কথাবার্তা বা আচরণ পরিণত বয়সে রিপিট করা মোটেও মানায়না। এমনকি বাপদাদারা যেসব কথা বলতেন বা যেসব কাজ করতেন হাল আমলে হুবহু তাই বলতে হবে তাই করতে হবে সেটাও কাজের কথা নয়। এখন যুগ বদলেছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বাপদাদাদের নকল করে এ জামানায় চালানো একেবারেই ঠিক নয়।

বাংলাদেশ যেসব রাজনৈতিক দল ষাটবাষট্টি বছর ধরে জনগণের সেবায় কাজ করে আসছে তারা এটা ভালোভাবেই বোঝে। এরা এখন অনেক ম্যাচিয়ুর। তারা জানে, ষাটের দশকের মতো কালাকানুন বাতিল করা বা পুলিশি জুলুম বন্ধ করার দাবি তোলা এখন একেবারেই অবান্তর। এখন আইনের কালোধলো নাই। সরকার চালাতে হলে কঠোর হতে হবে; শক্তপোক্ত আইন লাগবে। এলিট বাহিনী দরকার হবে। ক্রসফায়ার আর এনকাউন্টার ছাড়া ক্রাইম কমানো যায়না।

দেশের সম্পদ পাচার রোধে পিতাপিতৃব্যরা যেসব সাতদফা-চোদ্দোদফা দাবি তুলতেন তা আগের জেনারেশনে চলতো, এই জেনারেশনে চলেনা। এখন সাদাকালোয় মিলিয়ে বাজেট না করলে গ্রোথকার্ব ফ্লাট হয়ে পড়ে। গ্যাসতেল সুলভে বিদেশি বাজারে বেচতে না পারলে জনগণের ভাতকাপড়ের আকাল হবে।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে জ্ঞানগম্যি অনেক বেড়েছে। সেই মোতাবেক সংবিধান সংশোধন হচ্ছে। এখন আমরা কেমন সুন্দর ধর্ম নিরপেক্ষতার সাথে রাষ্ট্রধর্ম আর সকল ধর্মের সমান মর্যাদা পাচ্ছি। সেইসাথে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আরো কত কী যে সব একযোগে পাচ্ছি।

প্রাচীনপন্থি কিছু লোক এ নিয়ে খামাখা মন খারাপ করছেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছেন না যে বাষট্টি বছরের ম্যাচিয়ুর পক্ষে বিগত দিনের কথা ধরে কাজ করা বালকসুলভ চপলতা মাত্র।

৯ জুলাই ২০১১

সরকারি অফিসারের অভিজ্ঞতা

শুধু জ্ঞান আর বুদ্ধি থাকলেই হয়না কাজকর্ম ঠিকমত করতে হলে অভিজ্ঞতাও দরকার হয়। বিসিএস ক্যাডারদের এটা বেশ বোঝা যায়। ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রদের মধ্যে থেকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করে ঝাড়াই বাছাই করা হয়। রিগরাস বাছাই প্রক্রিয়া। জ্ঞান, বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যারা তুখোড় তাদের নির্বাচন করা হয়। নিয়োগের পর তাঁরা প্রায় তিরিশ বছর চাকরি করেন।

কর্মরতকালে তাঁদের অভিজ্ঞতাহীনতার প্রভাব সবাই হাড়ে হাড়ে টের পায়। ফাইল সই করতে ইনারা দিনের পর দিন ভাবনা চিন্তা করেন। ফাইল নড়েনা। কাজ থেমে থাকে। সমস্যা বাড়ে; জটিলতা বাড়ে। এমনি করেই তাঁদের চাকরির মেয়াদ কেটে যায়। এরমধ্যে তাঁরা প্রশিক্ষণ নেন, বিদেশ ভ্রমন করেন, ধাপে ধাপে প্রমোশন পান। শেষপর্যন্ত অনেকেই উপসচিব সচিব হয়ে রিটায়ার করেন।

রিটায়ারের পরেই ইনারা পত্রপত্রিকায় স্তম্ভ লেখা শুরু করেন আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল জনসমক্ষে পেশ করতে থাকেন। সকল সমস্যার এমন সহজ সরল ও কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করেন যে, দেখে দেশের সবাই স্তম্ভিত পড়ে।

সরকারি অফিসারের চাকরির মেয়াদ আশি বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলে বোধকরি এঁদের অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগানো যাতে পারে।

৯ জুলাই ২০১১

বাংলাদেশ পুলিশ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য

ফেসবুকে জনৈক বন্ধু পুলিশকে "কুত্তার বাচ্চা" বলেছেন। বোধকরি কুকুরের প্রভুভক্তির কথা বিবেচনা করে এই উক্তি করেছেন। এটা আদৌ যুক্তি সংগত হয়নি। আমাদের পরিবারে দুটো কুকুর পালন করি। এদের কখনই পুলিশের মতো আচরণ করতে দেখিনি। কুকুর অবলা প্রানী। তারা মানুষের সব কথার প্রতিবাদ করতে পারেনা। তাছাড়া, মানহানির মোকদ্দমাও তারা করতে পারেনা।

স্মরণ রাখা আব্যশক যে, বাংলার পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। সম্রাট অশোক বা তার আগে থেকেই এর গোড়া পত্তন। তবে হাল আমলের পুলিশের ঐতিহ্য কর্নওয়ালিশের কাল থেকে প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভেবে জারি রয়েছে (দ্রঃ বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েবসাইট)। সেকাল থেকেই পুলিশ দেশ ও জাতির স্বার্থে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করে আসছে। এরজন্য পুলিশকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় ও নিদারুন ঝুঁকি নিতে হয়। আগ্রসরমান মিছিলে মৃদু লাঠিচার্জ করা, বেআইনি সমাবেশে টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটানো ও উচ্ছৃখল জনতার দুচারদশজনকে গুলি প্রদানকরা পুলিশের আব্যশিক কাজের মধ্যে পড়ে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আইজিপি সাহেবও বায়ান্নসালে এই কাজগুলো করেছিলেন। পত্রপত্রিকা এসব বিষয়ে অনেক রটনা প্রচার করে।

তাছাড়া, পুলিশের বিরুদ্ধে উৎকোচ প্রীতির অপবাদ আছে। দুষ্টজনেরা এই অপবাদ ছড়ায়। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, সজ্জনেরা পুলিশকে সহায়তা করেন ও পুলিশের উপর ঐশী আশীর্বাদ বিরাজ করে। এই কারণে, স্বনামে-বেনামে জমাজমি-অট্টালিকার মালিকানা হস্তগত হয়। পুলিশ গৃহিণী স্বর্ণালংকার ভারাক্রান্ত হতে থাকেন। পুলিশ সন্তান স্বদেশে ও বিদেশে পড়ালেখা করতে পারে।

পুলিশ বাহিনী কোন রটনার পরোয়া করেনা। তারা ইংরেজ আমল থেকে ভায়া আয়ুব-ইয়াহিয়া-এরশাদ হয়ে হালের আলতাফসাহারা আমল পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পুলিশি ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে। ইংরেজ আমলে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে পুলিশের দারোগা বংলার চাষীকে নীলচাষে উদ্বুদ্ধ করার কাজে রত হতেন। সন্ত্রাসনির্মূল লক্ষ্যে মাস্টারদা ও অনুরূপ অন্যান্যকে ধরে এনে ফাঁসিকাঠে লটকানোর ব্যবস্থা করতেন। বায়ন্ন সালে দেশের সংহতি রক্ষায় উদ্বেগাকুল পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্রমিছিলে গুলি চালাতেন। একই কারণে উনসত্তরে উচ্ছৃংখল জনতার উপর লাঠিচার্জ করা, টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া আর গুলি চালানো পুলিশের নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছিলো। ইয়াহিয়া আমলে পুলিশি ঐতিহ্যে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। এ সময় পুলিশ বাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়ে। চৌত্রিশহাজার বাঙালি পুলিশের তেরোহাজার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় (দ্রঃ প্রাগুক্ত)। বাংলাদেশ স্বাধীন

হবার পর পুলিশ আবার স্বীয় ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার কাজে সচেষ্ট হয় ও এ বিষয়ে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করতে থাকে।

মাঝেমাঝে পুলিশের প্রতি সরকারের আস্থায় ঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় পুলিশের মনোবল চাঙ্গা করতে সরকারিদলের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী পুলিশের সাথে একযোগে কাজ করে। তাছাড়া, পুলিশের কার্যকরিতা বাড়ানোর জন্য র‍্যাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও বিবিধ জানা-অজানা বাহিনী তৈরি করা হয়েছ। শুরুতে এ নিয়া কিছুটা বিভেদ ও আন্তকলহের সূচনা হয়েছিলো। তবে, পুলিশ বাহিনী ধৈর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে এই সংকটের সুরাহা করেছে।

ইদানীং পুলিশ আর এক সংকটে পড়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে কিছু হেরফের করা বা আসামী খুঁজে না পেলে বদলি আসামী হাজির করা পুলিশি ঐতিহ্যের আংশ। সরকার এ ব্যাপারে কর্মরত পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছে কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করছে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যকে দেশ বিদেশ থেকে ধরে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। এর ফল যে ভালো হবেনা তা বলাই বাহুল্য। সরকারের এ ধরনের কাজে কর্মরত পুলিশ সদস্য নিজের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবেন। এরকম হলে, পুলিশ বাহিনীর পক্ষে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করা সম্ভব না ও হতে পারে।

৬ জুলাই ২০১১

উর্দি ও সন্ত্রাস নিরসন - পাকিস্থানি স্টাইল

পাকিস্থান রাষ্ট্রের হালহকিকত দিনকে দিন জটিল হয়ে পড়ছে। সেখান কারা যে সন্ত্রাসী আর কারা যে তা নয় তার হদিস করা খুবই দুরূহ। বিন লাদেন প্রায় আর্ধযুগ ধরে এবোটাবাদে সেনানিবাসের পড়সি হয়ে দিন কাটাচ্ছিলো। কেউ তার খোঁজ পাচ্ছিলো না। মার্কিনিরা হেলিকাপ্টারে করে উড়ে এসে যখন তাকে গুলিকরে মারলো তখনই তার খোঁজ বেরুলো। সেই গোসসায় ছয় তালেবানি চেলা নৌবাহিনীর হাইসিকিউরিটি এয়ারবেজে ঢুকে সব লন্ডভন্ড করলো। ৭২ মিলিয়ন ডলারের দুখানা মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভেঙ্গে তছনছ করলো। তাদের চারজন গুলি খেয়ে মরলো, বাকি দুজন বহাল তবিয়তে নিজ ডেরায় ফিরেগেলো।

ঘটনাবলীর হকিকত বিচার করে এক সাংবাদিক যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। লাদেনি সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর মধ্যেই ঠাঁই পেয়েছে। এ খবর চাউর হওয়ামাত্র সেলিম সাহজাদ নামের সাংবাদিক একেবারে গুমখুন। কয়েকদিন নিখোঁজ থাকর পর, তার ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়াগেল দেড়শ কিলোমিটার দূরের এক জংলি গ্রামে।

বাজারে জোর গুজব যে পাকিস্থানে রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্রযন্ত্র চলছে। ঐতিহ্যবাহী, গৌরবোজ্জ্বল ও সুশৃংখল সে দেশের সবকিছু কন্ট্রোল করছে।

সেনাকর্তারা আইনকানুন জারি করে। তাদের ইশারায় আফসআদালত চলে। তাদের কথায় রাজনীতিবিধরা উঠবস করে। ব্যবসাবাণিজ্য এখন উর্দিওয়ালাদের দখলে। স্টকএক্সচেঞ্জের লায়নস শেয়ার সেনাবাহিনীর হাতে। জমিজিরাত, কলকারখানা, ব্যাংকবীমা, এয়ারলাইনস, তেলগ্যাসপাওয়ার ও টেলিকমে তাদের মালিকানা পাকপোক্তো। শিক্ষা বাণিজ্য ও বিনোদন বাণিজ্যেও তাদের হতে আছে। এছাড়াও, তাদের মুদিখানা ও বেকারির চেইনস্টোর আছে। তারা চাল-ডাল-তেল-নুন-পিঁয়াজ-মরিচ ও কেক-বিস্কুট-পেস্ট্রি বিক্রি করে।

এ নিয়ে সেনাকর্তাদের কোন অনুতাপ নাই; বরং তারা বেশ শ্লাঘা অনুভব করে। তাদের ধারণা, অন্যরা সবাই অকম্মারধাড়ি আর মহাবজ্জাত। সিভিলসার্ভেন্টরা যারপরনাই অলস আর দুর্নীতিবাজ। ব্যবসায়িরা সব চোর আর বাঁটপাড়। বাগাড়ম্বর আর লুটপাট কারা ছাড়া অন্য কোন কাজে রাজনীতিবিদরা হাত দেয়না। উর্দিওয়ালারাই ও দেশ একমাত্র এফিসিয়েন্ট ও কাজেরলোক। সুতরাং, চন্ডিপাঠ থেকে জুতো বুরুশ করা সব সেনাবাহিনীর এখতিয়ারেই থাকা দরকার।

হালে সেখানে আবার আর এক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। সিন্ধের প্রেস্টিজিয়াস রেঞ্জার বাহিনী ১৭ বছরের কিশোর সরফরাজ শাহকে গুলি করে মেরেছে। এই কিশোর নাকি ভয়ানক সন্ত্রাসী। সাত রেঞ্জার সরফরাজ শাহকে ধরে করাচির এক পার্কে নিয়ে যায়। তারপর, তার উরু আর পেটে গুলি করে পার্কে ফেলে রাখে।

চিকিৎসার অভাব ও রক্তক্ষরণজনিত কারণে সরফরাজ শাহ মারা যায়। এতে খাপ্পা হয়ে উচ্চ আদালত সুয়োমোটো আদেশ জারি করেছ। ঐ আদেশ বলে সিন্ধ রেঞ্জারসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইজাজ চৌধুরিকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের মহা পরিচালক, প্রাদেশিক মুখ্য সচিব, প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র সচিব ও কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে সমন জারি হয়েছে। উচ্চ আদালত ঘোষণা দিয়েছে যে, বিদ্যমান সন্ত্রাস আইনে বিচার করে রেঞ্জারের ঐ সাত সদস্য ও তাদের আরও নয় সহযোগির শাস্তি বিধান করা হবে।

এসব ঘটনায় সন্ত্রাস নির্মূলকাজে মহাবিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। কারা যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে আর কারা যে সন্ত্রাসনির্মূলকাজে নিয়োজিত তা সব তালগোলমাল পাকিয়ে গেছে। এলিট বাহিনীর প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাচ্ছে। এরকম হলে তো সন্ত্রাসনির্মূলকাজ এলিট বাহিনীর এখতিয়ারের বাইরে চলে যাবে। দেশের মানুষ তখন ঘোর দুর্দিনে নিপতিত হবে।

আমাদের ভাগ্যভালো যে, একাত্তর সালেই আমরা পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমাদের 'কী দুর্দশাই হত তা না হলে'।

১৭ জুন ২০১১

বাল্যবিবাহ নিবর্তক ব্যবস্থা

খবরে প্রকাশ (প্রথম আলো, বুধবারের ক্রোড়পত্র, ২৫ মে ২০১১) কুমিল্লা এক কলেজ বাল্যবিবাহ রোধে যুগান্তকারি এক ব্যবস্থা নিয়েছে। ঐ কলেজে বিবাহিত মেয়ের ভর্তি নিষিদ্ধ, আর ভর্তির পরে বিয়ে হলে ছাত্রত্ব বাতিল। বোধহয়, মেয়েরা ইস্কুলের গন্ডি পেরোতে না পেরোতেই বিয়ের জন্য হুড়োহুড়ি লাগায়। বাল্যবিবাহের আকর্ষণে তারা মা-বাপ, পরিবার-পরিজন বা সমাজ সংস্কারের তোয়াক্কা করেনা। আর বিয়ের পরেই সংসারের কাজকর্ম বাদ দিয়ে দলে দলে কলেজে ভর্তি হয়। এতে যে দেশ ও সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় তা তার আদৌ বিবেচনা করেনা। এর প্রতিকারের জন্য নিবর্তনমূলক এহেন ব্যবস্থা নিশ্চয় আব্যশক। দেশেরলোক, বিশেষ করে, নারীপ্রগতি সপক্ষজনেরা এরফলে বেশ স্বস্তি বোধ করবেন।

বাল্য-উদ্বাহী মেয়েরা কলেজের সীমিত সংখ্যক আসনের প্রায় সবগুলোই দখল করে। ফলে, বংশরক্ষা ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করার কঠিন সামাজিক দায়িত্বে নিয়োজিত মা-বাপের নয়নের মণি ছেলে সন্তান কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাধ্য হয়ে তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় আর যৎকিঞ্চিত বখাটেপনা করে।

এছাড়াও, উচ্চশিক্ষাভিলাষী অনেক কৃতদার যুবাপুরুষ কলেজে ভর্তি হয়। অনেক সুযোগ্য পুত্র জনসেবাজনিত কারণে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমনকি নাতি-নাতনি স্বগৃহে রেখে বছরের পর বছর কলেজে যাওয়াআসা করে। সকল সুয়ো মেয়েরা যদি এসব কৃতদার যুবা পুরুষের সাথে যোগ দেয় তাহলে কলেজের বোঝা বাড়ে। এতে পাঠদানে বিষম বিঘ্ন ঘটে ও কলেজ প্রশাসনে ভয়ানক বিশৃংখলা দেখা দেয়।

অবিবাহিত কিশোরী সুরক্ষায় দেশে বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। গ্রামেগঞ্জে হাইবাজেট হাইভিজিবিলিটি প্রচার প্রদর্শনী সাড়াম্বরে চলছে। নারী নির্যাতনরোধী কঠিন কঠিন আইন চালু হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ে ফতোয়ামূলে শাস্তি প্রদান এখন সম্পূণরূপে নিষেধ। দারিদ্রবিমোচন কার্যক্রমের সাফল্যের কারণে সর্বস্তরের মাবাবা এখন অতি সহজে কিশোরী মেয়ে প্রতিপালন করতে পারে।

এতসবের পরেও কোন মেয়ে যদি হুইমজিকালি বাল্যবিবাহে রত হয় আর কলেজে ভর্তি হবার বায়না ধরে তাহলে দেশের লোকের উচিত ওই মেয়ের মাথা মুড়িয়ে তার নাকে ঝাঁমা ঘষে দেওয়া।

২৫ মে ২০১১

সন্ত্রাসী লিমন

লিমনের বয়স কমবেশি আঠারো; সে লাল গেঞ্জি গায়ে দেয়। সুতরাং সে অবশ্যম্ভাবী সন্ত্রাসী। হতে পারে, এখন সে উদীয়মান। ভবিষ্যতে সে প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ সন্ত্রাসী হবেই হবে।

শুধু লিমন নয়, তার বাপ ও উর্ধ্বতন সাতপুরুষ সবাই সন্ত্রাসী। কারণ, আইনরক্ষা বাহিনীর বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষন থেকে জানা যায় যে, দেশের সব লোক হচ্ছে বর্ন ক্রিমিনাল। এদেরকে সব সময় যদি শক্ত নিয়ন্ত্রনে না রাখা হয় তাহলে সমাজ অচিরেই দুর্নীতিতে তলিয়ে যাবে। দেশের শান্তিশৃংখলা সব বরবাদ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রযন্ত্র বিলকুল বিকল হয়ে পড়বে। সবাইকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রনে রাখা সাধারণ পুলিশের একার কর্ম নয়। এর জন্য দরকার জাঁদরেল এলিট বাহিনী।

শরীরে ক্রিমিনালি রক্ত আছে বলে পাড়ার লোক সব লিমনের পক্ষ নিয়েছে। এর সাথে যোগ দিয়েছে কিছু দুর্মুখ সাংবাদিক আর দেশি বিদেশি কিছু চক্রান্তকারী। এরা র‍্যাবের উপর মিছামিছি দোষ চাপাচ্ছে। তারা ডাঁহা মিথ্যা রটনা করে বেড়াচ্ছে যে, র‍্যাব বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটায় আর নির্দোষ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করে। গুজব ছড়াচ্ছে যে, রাতের অন্ধকারে পুলিশ গ্রামেগঞ্জে ডাকাতি করে বেড়ায়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে র‍্যাবের কতলোক যে আহত-নিহত হয়, সেসব খবর তারা একদম চেপে যায়। আর সুবিধামত র‍্যাব পরিচালকের বক্তব্য বিকৃত করে। এদের লাগাতার প্রচেষ্টার কারণে লিমন জামিন পেতে সমর্থ হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল সরকারি কর্মকর্তা এবিষয়ে সবিশেষ অবগত। আইন সচিব সরকারি তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে, র‍্যাব কখনই লিমনের প্রতি গুলি ছোঁড়েনি।

সত্যিসত্যিই গুলি খেয়ে লিমন একটা ঠ্যাং হারিয়েছে একথা এখন আর জোর দিয়ে বলা যাচ্ছেনা। আসলে, সন্ত্রাসীরা আত্মগোপন করতে খুবই পারদর্শী। পোড়খাওয়া সন্ত্রাসী সাকুল্য শরীর নিয়ে দিনের পর দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে। একজন উদীয়মান সন্ত্রাসী কৌশলে নিজের একটা ঠ্যাং গোপন করে রাখবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

২১ মে ২০১১

লাল জামা ও দুষ্টের দমন

অপরাধ দমন ও জনস্বার্থ সুরক্ষার জন্য আইন ও আইন-প্রয়োগের সরলীকরণ খুবই উচিত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব ভাগবন্টন করে দিলে আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়ে ও প্রকারান্তরে, সুবিচার বঞ্চিত হয়। এবিষয়ে বাংলাদেশ অতিশয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। জনে জনে দায়িত্ব বাঁটোয়ারা না করে, দুষ্টদের খুঁজে বের করা, তড়িৎ বিচার করা ও তাৎক্ষনিক দন্ডাদেশ কার্যকর করার সব দায়িত্ব এক পাত্রে অর্পণ করা হয়েছ। এতে রেপিড অ্যাকশন হচ্ছে। খুব ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। দুবৃত্তরা সব ঠাস ঠাস করে নিকাশ হচ্ছে।

লুকিয়ে থাকা দুবৃত্তদের খুঁজে বের করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। সাধারণ লোক সব সময় এদের চিনে উঠতে পারেনা; তাদের খোঁজখবরও দিতে পারেনা। তাছাড়া, সাধারণ লোক ক্ষুদ্র ব্যাক্তিস্বার্থে ভুল তথ্যও দিতে পারে। পক্ষান্তরে, অপরাধ জগতের বাসিন্দারা দুষ্ট লোকের নাড়িনক্ষত্র সব জানে। তারা সঠিক সংবাদ দ্রুত ও সময়মত দিতে পারে। তাই,বিধি মোতাবেক দুষ্টদলের প্রাক্তন কিংবা চলমান সদস্যকে সোর্স হিসাবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছ।

দ্রুত অপরাধ দমন বিষয়ে সম্প্রতি আরও একধাপ অগ্রগতি হয়েছ। এখন পোশাকের রং দেখে অপরাধী সনাক্ত করার কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। বুড়ো আঙ্গলের ছাপ দেখে আসামী সনাক্ত করার মতো জটিল ও সময়-সাধ্য পুরনো পদ্ধতির তুলনায় এটা একটা যুগান্তরকরি আবিষ্কার। আগে থেকেই জানা ছিল যে, সাধু-সন্তরা সাদা পোশাক পরে। গেরুয়া পরলে মানুষ হয়ে যায় বাউলবৈরাগি। তড়িৎ দুষ্ট দমনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য দরকার হয় বিশেষ এক রঙ্গের পোশাক। বোধকরি, মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে লাল রঙ্গের জামা দুর্বৃত্ত ও পলাতক আসামীর পরিচয় নির্দেশ করে।

এখন আর কোন চিন্তা নাই, লাল জামা গায়ে দেখামাত্র গুলি করতে পারলে দেশ থেকে সব অপরাধ একেবারে সাফ।

১৯ এপ্রিল ২০১১

সুদের ব্যবসা ও দেশের ভাবমুর্তি

সুদখোর মহাজনেরা চিরকাল ধরেই গ্রামের গরিব মানুষকে শোষণ করে এসেছে। এদের অত্যাচারে গ্রামের হাজার হাজার পরিবার জমাজমি ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বসান্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু হয়ে শহরের বস্তিতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। হাল আমলে আর এক উৎপাত শুরু হয়েছে। দেশী মহাজনদের সাথে যোগ দিয়েছে বিদেশী বেনিয়ারা। তারা এক পন্ডিতকে দিয়ে এমন এক ঋণকৌশল আবিস্কার করেছে যা থেকে দুঃস্থ নারীরও নিস্কৃতি নাই।

এই আবিস্কারের ফলে নিভৃত পল্লীর দরিদ্রতম নারীও ঋণ নিতে শুরু করেছে। আর এই টাকার গরমে সমাজ ও পরিবারের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে হাটেবাজারে বেরিয়ে পড়েছে। শোনা যায়, গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের তোয়াক্কা না করে তারা ঋনের টাকায় বাড়ি বানায়, ভালো খায়, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে এই বিলাসিতা মানায় না।

এটা এদেশে এতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে যে, দেখাদেখি পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ তা নকল করতে শুরু করেছে। ঐসব দেশের গরিব নারীরাও এখন এই ঋণজালে ধরা পড়ছে; তাদের পরিবারের লোকজনকে কষ্টের মধ্যে ফেলছ। আমাদের সমাজ তো উচ্ছন্নে গেছেই, সাথে সাথে অন্যদেরও আমরা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

এই পন্ডতের কৃতিত্বে আহ্লাদিত হয়ে বিদেশীরা তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দিয়েছে। প্রাইজদেনেওয়ালারা এদেশের শত শত ফুলের মতো পবিত্র ও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ চরিত্রের জনদরদির মধ্যে কাউকে খুঁজে পেলোনা!

তবে এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি খুবই ক্ষুন্ন হয়েছ। একজন কুসীদজীবী বাংলার নারীকে ঋণগ্রস্ত করবে আর সেই কলাকৌশল পৃথিবীর দেশে দেশে চালান দেবে, তা কোনমতেই সহ্য করা উচিৎ নয়। দেশপ্রেমী বাংলাদেশীর আবশ্যিক কর্তব্য হবে এই অনাবশ্যক ও খতরনাক বুড়টাকে সমাজ থেকে বহিস্কার করা।

দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করার জন্য আরো অনেক সহজ সরল পথ আছে। দরকার হলে আমরা বলিউডের নাচনেগানেওয়ালাদের এনে জাঁকজমকের জলসা জমাতে পারি। এরজন্য ইসলামী ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়ার সুবর্ন সুযোগতো আছেই।

৬ মার্চ ২০১১

জজসাহেবদের লেনদেন

সরকারি কর্মচারির, বিশেষ করে প্রশাসকগণের কর্মকর্তার, সুযোগ-সুবিধা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা কারো অজানা নয়। বেতনের চেয়ে তাদের উপরি বেশি। বিয়েরবয়েসি কন্যার মাতাপিতার কাছে উদিয়মান কর্মকর্তা সব থেকে বেশি পছন্দের।

জজ সাহেবরাও সরকারি কর্মচারি। বেতন বহির্ভূত আয়রোজগারের সুযোগ তাদের আছে এমন রটনা লোকসমাজে প্রচলন ছিলো। আদালত অবমাননা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে এ বিষয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করা যেতনা। কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকের কাছে তারা ছিলেন ব্রাত্যজন। এ নিয়ে জজসাহেবদের হয়তো মনঃকষ্ট ছিলো।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাম্প্রতিক ঘোষোণায় জজসাহেবদের মনঃকষ্ট কিছুটা বোধহয় উপশম হয়েছে। তিনি পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছেন যে, জজসাহেবরা নাজির মারফত লেনদেন করেন ও প্রয়োজন মত ফ্রিজটা টিভিটা চেয়ে নেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে সাধুবাদ দিতে হয়। এখন আর কারো কোন আক্ষেপ থাকলো না। আমরা নিশ্চিন্ত মনে জজসাহেবদের সাথে লেনদেন করতে পারবো।

১৫ নভেম্বর ২০১০

বৈধ-অবৈধ সাংবিধানিক জটিলতা

বাংলাদেশে অবৈধ কিছু থাকতে পারে না। বর্তমান সরকার এটা সহ্য করবেনা। প্রাক্তন সরকার, এমনকি সেনাসমর্থিত অন্তবর্তিকালীন সরকারও এটা টলারেট করেনি। এদিক থেকে তাদের সকলেই দেশপ্রেমের যে নিদর্শণ রেখেছ তা নিসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

অবৈধ দূরীকরণ কাজে সরকার মোটামুটিভাবে দু ধরনের কৌশল ব্যবহার করছে। দুটোই খুব কার্যকর।

কালের প্রবাহে অনেক ট্রাডিশন আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে।একই সাথে,সমকালীন উন্নয়নের জোয়ারে অনেক প্রথা মানুষের জীবন-জীবিকার চাহিদায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আউটডেটেট আইনকানুন জারি থাকার কারনে এসব অনেক প্রথা আবৈধ হিসাবে গোচর হয়। সরকার খুব দূরদর্শিতার সাথে পশ্চাৎপদ আইনকানুন সংস্কার করছে। ফলে ঐ সব প্রথা থেকে অবৈধতার আবরণ দূর হয়ে যাচ্ছে। এখন কালো টাকা ধপধপে সাদা হতে পারছে। চাঁদাবাজি আইনের আওতায় আসছে। কেন্দ্রীয় নেতারা সংবিধানিক অধিকারবলে স্থানীয় সরকারের উপর খবরদারি করতে পারছে। ব্রীজ নির্মাণ বা বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থপনে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে যোগ্য লোকের কাছে এসেট্‌ট্রান্সফার করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

তবে সমাজের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী অবৈধ বিষয়গুলো কঠোর হাতে নির্মূল করা হচ্ছে। নোংরা সব হৃদয় যা সামাজকে কলুষিত করছিলো তা ক্লিন করা হয়েছে। দরকার হোলে এরজন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। বিপদজনক অব ব্যক্তিকে সরকারের সুশৃঙ্খল বাহিনী এক এক করে ধরছে আর এনকাউন্টারে নিয়ে যাচ্ছে। নদীনালা, রাস্তাফুটপথ ইত্যাদির আবৈধ সব স্থাপনা ভেংগে দেওয়া হচ্ছে।

মোটকথা, রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা সেনা সমর্থন নির্বিশেষে, সরকার লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে দেশে বৈধতার এক অপূর্ব বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। দেশের লোক এখন সুস্থির জীবন যাপন করতে পারছে। কিন্তু হঠাৎ করেই এক জটিল প্রশ্ন সবার সামনে এসে হজির হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, সংবিধানের কিছু অংশ অবৈধ।

আংশিক অবৈধ সংবিধানের ছত্রছায়ায় দেশের শাসন চালানো নিয়ে মহা বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অবশ্যমান্য; অন্যদিকে, সংবিধানের স্বত্বাধিকার হলো জাতীয় সংসদের। কিভাবে এই বিতর্কের নিরসন হবে সে বিষয়ে কেউ মতস্থির করতে পারছে না। ভেবে ভেবে অজ্ঞ-বিজ্ঞ সবাই গলদঘর্ম হচ্ছে। অনেকেই এবিষয়ে সংসদকে রেফার করছে। আবার এই সুবাদে কেউ কেউ দেশবাসীকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে ।

৯ অক্টোবর ২০১০

সরকারি কর্মচারি নিয়োগ বিধি

ক্ষমতাসীন দল সরকারি কর্মচারি নিয়োগ বিধিতে উল্লেযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, এখন থেকে পরীক্ষিত দলীয় কর্মীর দ্বারা শূণ্যপদ পূরণ করা হবে। এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে দেশ ও জাতির বহুবিধ উপকার হবে।

এই ঘোষণা স্বচ্ছতার একটা অতি উৎকৃষ্ট নমুনা। প্রচলিত সিস্টেমে সব কিছু হয় পর্দার আড়ালে। যাঁচাই বাছাই করা হয় গোপনে। কেউ কিছু জানতে পারে না। মাঝে মধ্যে যখন সিস্টেম ফেল করে তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি কিছু কথা কানে আসে। তাছাড়া মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতা যাঁচাই করা হয় বলে যে দাবী করা হয় তা পুরোপুরি সত্যি নয়। এটা ওপেন সিক্রেট যে, আত্মীয় বা উৎকোচ সুবাদে 'নিজের লোক' চাকরি পাবার ব্যপারে আগ্রাধিকার পায়। এই সিস্টেমে চাকরি প্রত্যাশীরা বিভ্রান্ত হয়। কে যে উৎকোচ নেবার অথরাইজড পারসন, আর কোনটা যে খাঁটি প্রশ্নপত্র তা সব সময় জানা যায়না। অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়।

নতুন সিস্টেম একেবার ওপেন। কে কোন দলের কর্মী আর তাদের কার কি এচিভমেন্ট তা সবাই জানে। প্রত্যেকের প্রতিটা মহড়ার বিবরণ ফটোজার্নালিস্ট রেকর্ড করে রেখেছে। কারচুপি করার কোন সুযোগ নাই।

এছাড়াও, জনগণের ম্যান্ডেট মতো দেশ শাসন করতে হলে দলীয় কর্মী ছাড়া উপায় নাই। দলের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দেশের লোক দলকে ক্ষমতায় বসায়। দলের নেতারা সব সময় চায় তাদের ভিশন মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে - ঐ আদর্শের আলোয় জনগণের সেবা করতে। কিন্তু আমলারা বাদ সাধে। তারা জনগণের ম্যান্ডেটের তোয়াক্কা করেনা; মন্ত্রীদের কথা শোনেনা - স্যাবটাজ করে। তাই দেশের লোকের আশা পূরণ হয়না; তারা কষ্টে থাকে। দলীয় কর্মীদের দিয়ে আমলাদের হটাতে না পারলে এর থেকে পরিত্রাণ নাই।

আমেরিকার মতো আতি উন্নত দেশে এরকম ব্যবস্থা চালু আছে। সেখানে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অফিসে বহাল হওয়া মাত্র পুরনো সব সেক্রেটারি বিদায় দিয়ে দলীয় মতাদর্শের প্রতি বিশ্বস্থ নতুন এক দল সেক্রেটারি নিয়োগ করে। আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন দল এই রীতিই বলবত করছে। তারা গ্রাসরুট লেভেল শূণ্যপদ পূরণ দিয়ে শুরু করেছে, ক্রমে ক্রমে সচিব পর্যন্ত পৌঁছাবে।

৫ অক্টোবর ২০১০

হত্যা ও নিহত সমাচার

সীমান্ত প্রহরী অনেক সময় বর্ডার এলাকার লোকজনকে গুলি করে হত্যা করে। এটা একটা নৃশংস ও মানবাধিকার বিরোধি কাজ। এধরণের হত্যার ভিকটিম মানসিক ও শারীরিক, উভয়বিধ কষ্ট নিয়ে মারা যায়। মৃতব্যক্তির আত্মীয় পরিজন দুঃখ কষ্টে পতিত হয়। এছাড়াও তারা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে।

এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সীমান্ত প্রহরী পরস্পরের সাথে মত বনিময় করেছে ও ভবিষ্যতে এভাবে লোক হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে তারা হত্যা করার বদলে গুলি করে মানুষজন নিহত করবে।

হত্যা করা ও নিহত করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। হত্যা খুব রূঢ় কাজ - এরফলে মানুষ খুব কষ্ট পেয়ে ও মর্যাদাহীন অবস্থায় মারা যায়। সেই তুলনায়, নিহত করা অনেক সহানুভূতিশীল বিবেচনা। নিহত ব্যক্তি আরামের সাথে ও সম্মান বজায় রেখে মরতে পারে।

২ অক্টোবর ২০১০

নিয়োগ বানিজ্য ও জেলাধিপতির রোদন

নিয়োগ বানিজ্য বা ক্যাশ ফর চাকরি কর্মসুচি একচেটিয়াভাবে বিভাগীয় সরকারি কর্মচারির এখতিয়ারভূক্ত। নিয়োগ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কর্মচারির নিজস্ব একাউন্টে জমা করাই নিয়ম। সরকার দলীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এবিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সম্প্রতি কতিপয় অতি উৎসাহী নিম্নবর্গীয় রাজনৈতিক কর্মী ভ্রম বা লিপ্সা বশত এই এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা নিয়োগ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দলীয় একাউন্টে জমা রাখার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। এতে জন জীবনে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। তবে, এরফলে ডিসি বাহাদুরের রোরুদ্যমান হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি।

জেলাধিপতি স্বীয় রোদন সংক্রান্ত সকল সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে এটা ছিলো নিতান্তই প্রপঞ্চ - সাংবাদিক ও কার্টুনিস্টদের দৃষ্টি বিভ্রম। সাংবাদিক ও কার্টুনিস্টের চিকিৎসা হওয়া দরকার। চক্ষু চিকিৎসক এই চিকিৎসা করতে পারবে, না কী এর জন্য মনরোগ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে, সে বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

ডিসি ও তজ্জাতীয় রাজকর্মচারি স্বীয় অধিকারবলে সাধারণ মানুষকে সর্বদা অসহায় অবস্থায় রাখবেন। এটাই চিরন্তন বিধান। রাজনৈতিক কর্মীর হটকারিতাজনিত পরিস্থিতে নিজেকে অসহায় বিবেচনা করা ও স্বীয় অসহায়ত্ব জন সমক্ষে প্রকাশ করা রাজকর্মচারি আচরণবিধি সম্মত নয়। জেলাধিপতির এধরণের আচরণ শৃংখলাবিধির গুরুতর লংঘন। এটা কখনই মার্জনাযোগ্য নয়।

১ অক্টবর ২০১০

দিন বদলের সূচনা

দিন বদলের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার কথায় সীমাবদ্ধ নেই; বাস্তবেও দিন বদলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেশের একটা জেলায় অন্তত এর নজির আমরা দেখতে পাচ্ছি।

প্রশাসনে আমলাতন্ত্র চালু হয়েছিলো সেই ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্থান আমলে সাবেক হালেই তা জারি ছিলো। বাংলাদেশ আমলেও এর কোন রদবদল হয়নি। রাষ্ট্রীয় সেবা দানের জন্য পাবলিক সার্ভেন্টের দায়দায়িত্বের যে সব কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তা একেবারেই রূপকথার গল্প। আসলে পাবলিক সার্ভেন্ট মানে হলো পাবলিককে ধরে-বেঁধে-মেরে-ধমকিয়ে সোজাপথে রাখার জন্য পাবলিকের পয়সায় পোষা রাজকর্মচারি। এদের দাপট বিরাট; সম্মান সুউচ্চ।

জাঁদরেল ডিসি ম্যাজিস্ট্রেটের দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার পুরনো দিনের গল্প একটু আতিরঞ্জন হলেও হতে পারে। তবে হাল আমলের উপজেলা নির্বাহী যে স্কুলের হেডমাস্টার মশায়কে সভার মাঝখানে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে সে ব্যাপারে এখন আর কারো কোন সন্দেহ নাই।

একটা জেলায় সরকারি দলের ছোট বড় সব কর্মী কিন্তু আমলাদের ঐ রীতিরেওয়াজ বদল করার জন্য বেশ জোরেশোরে লেগেছে। তারা আইনিকানুন নিজের হাতে নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের তোড়জোড় দেখে জেলার ডিসি এডিসি ম্যাজিস্ট্রেটরা একে বারে দিশেহারা; তারা কান্নাকাটি করে বুক ভাসাচ্ছে।

অনেক দিনের অভ্যাস হঠাৎ করে ছেড়ে দিতে সবারই কষ্ট হয়। বিয়ের দিন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময়ও আমরা কাঁদি - সেটা দুঃখের নয়, সুখের কান্না। দিন বদলের আনন্দে আমলারাও আজ কাঁদছে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বরং উচিৎ দেশের বাকি তেষট্টি জেলায় এই আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

ইউপি সচিব ও পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনেকে আশা করেছিলো চাঁদাবাজীর পর ঘুষ বৈধ হবে। কিন্তু, বাস্তবে এ বিষয়ে কিছুটা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। সাটুরিয়ার জনৈক ইউপি চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে জন্ম সনদ দেয়ার জন্য ঐ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবকে সবার সামনে পঞ্চাশবার কানধরে উঠবস করিয়েছে।

অনেকের ধারনা, স্থানীয় পর্যায়ের এই ঘটনা আসলে বটমআপ পদ্ধবতিতে সারা দেশে ঘুষ নির্মূল অভিযানের সূচনা। তবে অন্য অনেকেই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করছে। তারা মনে করে, ইউপি সচিব নিজেকে যুগ্ম, অতি কিংবা পূর্ণ সচিবের সমগোত্রীয় মনে করবে আর ঘুষ নিবে, এটা কখনই টলারেট করা যায়না। তাছাড়া, এতো অল্প পরিমান টাকা ঘুষ নিতে রাজি হয়ে ইউপি সচিব অমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রতি কটাক্ষ করেছ। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এ প্রসঙ্গে আমরা স্বঘোষিত পল্লীবন্ধু ওরফে বরেণ্য শিল্পী প্রদত্ত বিশ্ব বেহায়া খেতাবধারী লেজে হুমো এরশাদের অবদান স্মরণ করতে পারি। তার সময়ে পাঁচটাকা কেজি দরের গম চুরি করা বন্ধ করার জন্য সিপাইরা ইউপি চেয়ারম্যানদের কান ধরে উঠবস করানো শুরু করেছিলো। আর এভাবেই এরশাদ কোটি টাকা দামের উড়োজাহাজ কেনায় পার্সেন্টেজ নেবার মতো মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছিলো। পরে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় ও সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ, রেল ইঞ্জিন, উড়াল সেতু ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করে।

(লেখার তারিখ উল্লেখ নেই; ফেসবুকে আপলোডের তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০)

বৈধ চাঁদাবাজী ও অন্যান্য

বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও অবৈধ ও বেআইনি সব কিছু বন্ধ করার জন্য বদ্ধ পরিকর। তাই, যা কিছু আবৈধ, যা কিছু বেআইনী, সরকার তার খতিয়ান নিচ্ছে আর একটা একটা করে তা আইনের আওতায় নিয়ে আসছে।

মিটিং-মিছিলে গুলি চালিয়ে (ক্ষেত্রবিশেষ ট্রাক চাপা দিয়ে) ছাড়া অন্য উপায়ে খুন করা ইতিপূর্বে ছিলো আইন বহির্ভূত। এর আগের সরকার এ ব্যাপারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলো। ফলে, আইন সম্মত বিচার বহির্ভূত হত্যা সরকারকে মেনে নিতে হয়েছে। তবে, মিটিং-মিছিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষ লাঠিপেটা করা বা গুলি চালানো বা এনকাউন্টারে মেরে ফেলা যাতে সুচারুরূপে ও নিয়মমাফিক হয় সেজন্য আদেশ নির্দেশ জারি করছে।

নির্বাচিত সংসদ প্রতিনিধি বা দলীয় কর্মীরা বেআইনিভাবে স্থানীয় সরকারের উপর প্রভাব খাটাতো ও উন্নয়নের টাকাপয়সায় ভাগ বসাতো। এ ধরনের বেআইনি কাজ প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই অনুচিত। তাই, জাতীয় সংসদে রীতিমতো বিল উত্থাপন করে বিষয়টিকে আইনের আওতায় আনা হয়েছ।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিকরা শ্রমিকের বেতন দিতো কম। এনিয়ে অনেক বিশৃংখলা ছিলো। এখানে বৈধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মালিকসহনীয় সর্বনিম্ন বেতন ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছ। এনিয়ে শ্রমিকরা উচ্চবাচ্য করলে পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করা হবে। এছাড়াও, অবৈধ ভাবে যাতে বাসভাড়া বাড়াতে না পারে সেজন্য বাসমালিকের সাথে আলোচনা করে ও তাদের সাথে একমত হয়ে বাসভাড়া নির্দ্ধারন করা হয়েছ।

অবৈধ ও বেআইনি হলেও চাঁদাবাজী প্রায় জাতীয় সংস্কৃতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সরকার এই চাঁদাবাজী আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। এখন এ বিষয়ে কারো কোন বিভ্রান্তি থাকবেনা; সবাই নির্ভয়ে যার যার মতো বৈধ ও আইনসম্মত কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

তবে, সরকারি কর্মচারীর ঘুষ খওয়া নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ আছে। এখনো চুড়ান্তভাবে বিষয়টির নিস্পত্তি হয়নি। এ সংক্রান্ত সব অবৈধ ও বেআইনি প্রথা ও আচরণ দূর করা বর্তমানে খুবই জরুরী হয়ে পড়েছ। সরকার যদি বিষয়টি প্রায়োরিটি ভত্তিতে আইনের আওতায় আনে তাহোলে সাধারন সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হয়।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী

বঙ্গদেশ প্রকৃতির রঙ্গভূমি। অনাবৃষ্টিতে মাঠের ফসল পোড়ে; অতিবৃষ্টিতে ধান পাট ডোবে। বন্যায় ঘরবাড়ি হাটবাজার রাস্তাঘাট ভেসে যায়। ঝড়ঝঞ্ঝায় গাছপালা দালানকোঠা ভাঙ্গে। তাপদাহ শৈতপ্রবাহে মানুষজন মরে। এসব হয় প্রাকৃতিক কারনে; রাশিচক্রে গ্রহ নক্ষেত্রের অবস্থান বা এল নিনো লানিনার প্রভাবে। এর উপর আমাদের কোন হাত নাই।

প্রকৃতির নিয়মের মতোই ব্যবসাবানিজ্য, আমদানিরফতানি ও কেনাবেচায় জোয়ারভাঁটা চলে। ফসল তোলার সময় ধানের দাম কমে, কৃষকরা মরে; মঙ্গার সময় চালের দাম বাড়ে, মহাজনের লাভ হয়। চাল-ডাল তেল-নুনের দাম বাড়ে, গরীবরা খেতে পায়না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব দেখা দেয়; মধ্যবিত্তরা হিমশিম খায়। অনিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে শপিংসেন্টার ছয়লাব হয়; আর ট্রাফিক জাম বাড়ে। নদীনালা, খালবিল ও বনজংগল লোপ পায়; ছয়তলা, দশতলা ও বিশতলা ইমারত প্রকাশ পায়। কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রভাব এসবের উপর পড়েনা।

একইভাবে, ঋতু চক্রের মতো, দেশ শাসনে লীগ দল পার্টি জামাতের আবর্তন ঘটে। গণতন্ত্র ও উর্দিশাসন পালা বদল করে। লাঠিবাজী বন্দুকবাজী চাঁদাবাজী টেন্ডারবাজী ইত্যাদির স্বত্বাধিকার বদল হয়। নদীনালা খালবিল ও সরকারি জমি পালাক্রমে একবার বেদখল হয় আবার দখল উচ্ছেদ হয়। আমাদের পিতৃ বা মাতুল বংশের কেউই এসব ক্রিয়ার কর্তা নয়, শুধু ভোক্তা মাত্র।

এসব ক্রিয়া দৈবনির্ভর বিধায়, বিজ্ঞজনেরা প্রত্রপত্রিকা ও টকশোতে ভাববাচ্যে ‘শুভবোধের চর্চা সঞ্চারিত হোক’, ‘আচরণবিধি থাকা উচিত’, ‘অর্থবহ করে তোলা জরুরি’, ‘তদারকি জোরদার করা প্রযোজন’ ও ‘ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার’ ইত্যাদি মতামত প্রকাশ করে থাকেন।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

ঢাকা শহরের ফুটপথ

ঢাকা শহরের রাস্তায় পায়ে হাঁটার কোন ব্যাবস্থা এখন আর নাই। বেশিরভাগ রাস্তায় ফুটপথ হয়তো ছিলোনা অথবা যেগুলো ছিলো সেসব বেদখল হয়ে গেছে। অনেকের ধারনা ভাসমান হকাররাই শুধুসব ফুটপথ দখল করছে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়।

গ্রাম থেকে আসা অনেক ছিন্নমূল পরিবার বনানীর মতো আবাসিক এলাকায় ফুটপথে থাকার জায়গা করে নিয়েছে। আবার বোনাফাইড প্লটমালিক বাড়ির সামনে রাস্তার খনিকটা জায়গা দখল করে বেগুন টমেটো ঢেঁড়শ লালশাকের চাষ করছে।

ফুটপথের উপরে ফুলের দোকান, ফলের দোকান, পত্রিকার স্টল, টি শপ, ড্রাগস্টোর কিংবা বাসের টিকিট কাউন্টার শহরের প্রায় সর্বত্র দেখা যাবে। অনেক হোটেলের রান্নাবান্না হয় ফুটপথ জুড়ে। কোথাও কোথাও ফুটপথের উপর ঠাঁই নিয়েছে হেয়ারকাটিং সেলুন। কোথাও কোথাও আবার ফুটপথের উপর বসে সকাল-সন্ধ্যার কাঁচা বাজার।

ছোট বড় সব মার্চেন্ট হাড়িপাতিল, থালাবাসন থেকে শুরু করে রড সিমেন্ট ইত্যাদি মালামাল দিনের বেলায় স্টোর করে রাখে তাদের দোকানের সামনে ফুটপথে। ফুটপথের উপর গাড়ী মেরামত কারখানা ও ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ ঢাকা শহরের কোন কোন জায়গায় বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

ডেভোলপাররাও পিছিয়ে নাই। তারা ইট-পাথর-রড মাসের পর মাস ফুটপথে স্টোর করে রাখে। তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজউকও একই ভাবে মার্কেট বানানোর সময় ফুটপথ দখল করে রাখে। রাস্তা খোঁড়াখুড়ির সময় ওয়াসা ও সড়ক বিভাগের ঠিকাদারারা এদের সাথে সামিল হয়।

এছাড়াও, পথচারীর রাস্তা পারাপারের জন্য ফুটপথ সংকুচিত করে ফুট ওভার ব্রীজ তৈরী করা হয়েছে। ল এন্ড অর্ডার নিশ্চিত করার জন্য ফুটপথের উপর পুলিশ চৌকি বসান হয়েছ।

মরার পরেও ঢাকাবাসী যাতে ফুটপথের সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য মিরপুরের একটা কবরখানা ফুটপথের খানিকটা নিজের সীমানার মধ্যে নিয়ে নিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, আয়রোজগার, বাস্তু সমস্যা সমাধান, বাণিজ্য বিস্তার, খাদ্য সুরক্ষা, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ল এন্ড অর্ডার বজায় রাখা ও কবরস্থানের স্থানসংকুলান ইত্যাদিতে অবদান রাখার জন্য ঢাকা নিবাসী সব ধরনের লোকই ফুটপথ দখলে সামিল হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, এই সর্বজনীন ঢাকাই সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক বিদেশী দূতাবাসও স্ব স্ব সীমানার ফুটপথ নিজ নিজ দখলে নিয়ে নিচ্ছে।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

কর্মফল নির্ণয়

মহাভারত বর্ণিত ধর্মযুদ্ধে প্রবিষ্ট বীরপুরুষগণের অস্ত্রাদি তদীয় সারথিগণের নিকট গচ্ছিত থাকিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সারথিগণের কেহ কদাচ তাহা দ্বারা কাহাকে অঘাত করিয়াছে এবংবিধ সংবাদ অদ্যপিও শ্রুত হয় নাই।

তথাপি, সাম্প্রতি বঙ্গদেশে এসর্ম্পকিত গুরুতর একটি প্রশ্ন মীমাংসা কল্পে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ঘটনাস্থলে দৃশ্যতঃ অনুপস্থিত রাজপুরুষের সারথি সমীপে রক্ষিত অস্ত্রাঘাতে মিত্রজন নিহত হইলে কর্মফল কাহাতে বর্তিবে। ইহা নির্ণয়ে নগর কোটাল বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছে।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

যুগোপযোগী লাইফস্কিল

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বাস্তবে তেমন কাজে আসেনা। বিদ্যা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারিক দক্ষতায় চৌকষ হওয়া। আজকাল স্কুল কলেজে ছেলেরা কালোপযোগী জ্ঞান দক্ষতা বেশ রপ্ত করছে। ছেলের লেখাপড়া নিয়ে মা-বাপের দুশ্চিন্তা একরকম দূর হয়েছে বলা যেতে পারে।

আগের জেনারেশনে সবাই আশা করতো, ছেলে নিয়োমিত স্কুল কলেজে যাবে। বিদ্যা চর্চা করবে। আর বছর বছর পরীক্ষা দিয়ে শেষে একটা ডিগ্রী পাবে। এরপর সরকারি কিংবা সওদাগরি অফিসে একটা চাকরি; তারপর সংসার ধর্ম। চাকুরি জীবনে টুক টুক করে সঞ্চয় করে শেষ বয়সে একটা বাড়ি বানাবে। রিটাইয়ার জীবন নাতিপোতা নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাবে।

এরকম ছাপোষা জীবন এখন আর চলেনা। হাল জমানায় জীবনযাত্রার মান অনেক বদলে গেছে। লাইফ এখন খুব ফাস্ট; ফাস্ট লাইফের জন্য চাই নানা উপকরন। গাড়ি বাড়ি ছাড়া জীবন এখন অচল। গাড়ির মডেল হবে লেটেস্ট । বাড়িতে থাকবে হাল ফ্যাশানের ফ্রিজ-টিভি-সোফাসেট। এরজন্য চাই টাকাপয়সা।

স্মার্ট অজেক্টিভ হিসাবে নির্ভেজাল চাকরি এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মোক্ষ লাভের জন্য এখন চালু হয়েছে নানা পথ। কোনটা সোজা, কোনটা একটু ঘোরা। তবে আদি ও অকৃত্রিম হলো বাহুবল ও অস্ত্রবল প্রয়োগ। আলেকজান্ডার বাবরের মতো মহাজনেরা এভাবেই রাজ্য জয় করেছিলো। সাধারন পরিবারের অনেকেই এই মহাজনী পথে এগিয়ে আসছে। তারা লাটিবাজি-বন্দুকবাজি করে সম্ভ্রান্তবংশীয় হচ্ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বা রাজনীতিতে সাফল হচ্ছে। দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করছে।

যোগ্য বাপের যোগ্য সন্তান হতে হলে অবশ্যই এই লাইফস্কিল শিখতে হবে। যত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে ততই মঙ্গল।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত, এই লাইফস্কিল চর্চা শুধু ভার্সিটিতেই সীমিত ছিলো। বড় ভাইরা হকিস্টিক দিয়ে শুরু করতো; ধীরে ধীরে চাকু, রামদা, পাইপগান ও কাটা রাইফেল হয়ে পিস্তলবাজিতে এসে গ্রাজুয়েসন লাভ করত। অগ্রগতির ধারায় এই সুযোগ কলেজ পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। এখন হাইস্কুলের ছেলেরাও এই এক্সট্রা কারিকুলার লাইফস্কিল শেখার সুযোগ পাচ্ছে।

কালক্রমে প্রাইমারি স্কুলেও এই কার্যক্রম চালু হবে। তখন প্রাইমারি স্কুলের কৃতি ছাত্র পিস্তল চালিয়ে বন্ধুবান্ধব বা পাড়াপ্রতিবেশীদের আহতনিহত করে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে।

১ সেপ্টেম্বর ২০১০

রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বদল প্রসংঙ্গে

বাংলাদেশে মত পথ আর দলের অন্ত নেই। রেজেষ্ট্রি করা দলই আছে কয়েক ডজন। এদের কোনটা লীগ, কোনটা পার্টি, কোনটা আবার জামাত। প্রত্যেক দলের আবার অনেক ডালপালা। এক এক দলের কর্মসূচি এক এক রকম; তাদের আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন। তবে, সব দলের মূল লক্ষ্য একটাই দেশকে রক্ষা করা, জনগণের সেবা করা।

দেশ শাগণের ক্ষমতা হাতে না পেলে তারা দেশরক্ষা বা জনসেবা করতে পারেনা। তাই শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য তারা সব সময় মহাব্যস্ত। এইজন্য তারা মহাসমরোহে ভোটযুদ্ধে অংশ নেয়।

ভোটাভুটি এক মহাযজ্ঞ। তখন ছোটদল বড়দল মিলে জোট বাঁধার ধুম পড়ে। বক্তৃতা গলাবাজিতে শহর বন্দর গ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। বাস ট্রাক মোটরসাইকেল বাহিত ক্যাডারের মহড়ায় রাজপথ জনপদ প্রকম্পিত হয়। পোস্টার ইস্তেহারে দালানকোটা ল্যাম্পপোস্ট ও গাছপালা বিচিত্র শোভা ধারন করে। ভোটের দিন হুড়হুড়ি, মারামারি ও ক্ষেত্রবিশেষ ব্যালট বাকসো ছিনতাই ছেলেবুড়োর আনন্দ বর্ধণ করে।

অবশেষে এক দল জেতে; অন্যরা হারে। যারা ভোটে জেতে তারা সরকার গঠণ করে; যারা হারে তারা হয় বিরোধি দল। এই হিসাবে, দেশে দল আছে মাত্র দুটি। একটা সরকারি দল, অন্যটা বিরোধি দল। সদ্যপ্রাপ্ত নতুন ভূমিকায় স্বমহিমা প্রকাশ করার জন্য দুই দলই, নিজ নিজ নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি সংশোধন ক'রে জোরেশোরে কাজ শুরু করে।

বিরোধিদলের প্রথম কাজ হলো, ইলেকশনে যেসব সুক্ষ কিংবা স্থুল কারসাজি হয়েছে সে বিষয়ে জনগণকে জানানো। এরপর তারা লাগাতারভাবে সংসদ বর্জন করে। তারা ননস্টপ জানাতে থাকে যে ক্ষমতাসীন দল দেশ ও দেশের সম্পদ বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিরোধিদলের নেতাকর্মীদের ধরে ধরে জেলে পুরছে। আর জনগণকে নিপীড়ণ ও নির্যাতনে জর্জরিত করছে। জনগণের দুর্দশা মোচনের জন্য ক্রমে ক্রমে তারা মিটিং, মিছিল, হরতাল, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়। এছাড়াও তারা বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছে আবেদন, নিবেদন ও কমপ্লেইন করে থেকে।

সদ্য ক্ষমতাসীন দল জনগণের ম্যান্ডেটে পাওয়া দেশ শাসনের অধিকার সর্বশক্তিতে বজায় রাখার প্রাতিজ্ঞা ঘোষণা করে। তারা বিরোধিদলের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে ভবিষ্যতে সোনার দেশ গড়ার দৃঢ় অংগীকার ব্যাক্ত করে। জাতীয়-অজাতীয় প্রাতিষ্ঠণসমূহের নাম পরিবর্তন করে। সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীর নিয়োগ-বদলী-ক্ষমতা-পদমর্যাদা পুনর্বিন্যাস করে। অতীত দুর্নীতির খতিয়ান

খুঁজে বিরোধিদলের নেতাকর্মীদের ধরে ধরে জেলবন্দী করে। দুর্নীতি, খুনজখম, অস্ত্রবাজি ও মিছিলে গোলাগুলি ইত্যাদি কর্মের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত স্বদলীয় নেতাকর্মীদের বেকসুর খালাস দেয়। দলীয় কর্মী ও সাংসদদের বিবিধ বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন কাজে সরিক হওয়ার সুযোগ করে দেয়। নেতাকর্মীদের সরকারি খরচে দেশবিদেশ ভ্রমন করার ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ও হাটবাজারে ভিত্তিপাথর বসানো ও সেগুলি উদ্বোধন করার দায়দায়িত্ব নেয়।

এছাড়াও, সরকারিদল তেল-গ্যাস-বিদ্যুত-সারের দাম বাড়ায়। চাল-ডাল-তেল-নুন-চিনির দাম ব্যবসায়ী-বান্ধব মাত্রায় ধার্য্য করে। একইভাবে বাসভাড়া, ট্যাক্সিভাড়া ও শ্রমিক মজুরি মালিকদের জন্য সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করে। দ্রব্যমুল্য কমাও, মজুরি বাড়াও, সার চাই ও বিদ্যুত চাই আন্দোলন শক্তহাতে দমন করে। এইসব গুরুভার কাজ সুষ্ঠরূপে করার জন্য কালাকানুন, বাকস্বাধীনতা, পুলিশী জুলুম, মানবাধিকার, বিচারবহির্ভূত হত্যা বা বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অতীত মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনা করে।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, বিরোধিদলের কর্মতালিকা ও সরকারিদলের কর্মতালিকা এক নয়। সরকারি দলের কর্মতালিকা স্বয়ম্ভু, শ্বাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। বিররোধিদলের কর্মতালিকাও তাই। এই কর্মতালিকার স্ট্যাটাস দেশের সংবিধানেরও উপরে। এব্যাপারে কোন দলের কিছু করার নাই। তবে সরকারি দল তাদের কাজের সুবিধার জন্য সংবিধান একটু আধটু সংশোধণ করে নিতে পারে।

নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে দলগুলির দায়দায়িত্ব ও কর্মতালিকা নির্ধারণ হয়।

গতকাল যারা বিরোধি দল ছিলো, আজ তারা হয়তো সরকারি দল; গত কালকের সরকারি দল আজ বিরোধি দল। তাই ভোটাভুটি শেষ হোলে দলের স্বভাব চরিত্র, কথবার্তা ও কাজকর্ম রাতারাতি বদলে ফেলতে হয়।

কিছু লোক আছে যারা বিরোধিদল ও সরকারিদলের সুস্পষ্ট কর্ম বণ্টন কিছুতেই বুঝতে চায়না। তারা খামাখা দলগুলির অতীত কর্মকান্ড ও ইলেকশনপূর্ব প্রতকশ্রুতির কথা নিয়ে পত্র প্রতিকায় লাখালেখি করে।

১০ আগস্ট ২০১০

লেখক পরিচিতি

জাহিদ হোসেন ১৯৪৯ সনের ১৩ মে খুলনা শহরে জন্মগ্রহণ এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৮ সানে ৬৯ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থায়ী নিবাস শেরপুরে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। পিতা শরিফ হোসেন ও মাতা কায়সার জাহানের সাথে তাঁর বেড়ে ওঠা খুলনা শহরে। তাঁর সহধর্মিনী রিহানা জাহান ছিলেন তাঁর সকল কাজের সহযোদ্ধা, যদিও ২০১২ সনে তাঁর জীবদ্দশাতেই স্ত্রী বিয়োগ ঘটে।

তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিকাল সায়েন্স (এলএসই) থেকে 'ম্যানেজমেন্ট অব নন-গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশে সেভ দ্য চিলড্রেনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু আগ পর্যন্ত তিনি নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স অ্যান্ড প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাক্টিভিটিস অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) এর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর রচিত অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী মননশীল চিন্তার অধিকারী লেখকের হাস্যরসাত্মক লেখনীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত ফেসবুক পোস্টগুলোতে; যার সংকলিত রূপ "তোতা কাহিনী ও অন্যান্য" গ্রন্থটি।